একজন আলী কেনানের উত্থান পতন

আহমদ ছফা

১

দে তর বাপরে একটা ট্যাহা।

ভিখিরিরা সাধারণত ভিক্ষাদাতাকেই বাবা ডাকে। আলি কেনান দাবি ছেড়ে বসল সম্পূর্ণ উলটো। অর্থাৎ সে ভিক্ষাদাতার বাবা এবং একটা টাকা তাকে এক্ষুনি দিয়ে দিতে হবে। একেবারে যাকে বলে কড়া নির্দেশ। এই চাওয়ার মধ্যে রীতিমতো একটা চমক আছে।

লোকটা সদরঘাটের লঞ্চ থেকে এই বুঝি নেমেছে। পরনে ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি। দোহারা চেহারার ফুলো ফুলো মুখের মানুষটি। আলি কেনানের মুখ থেকে সদ্যনির্গত বন্দুকের গুলির মতো শব্দ কটি শুনে কেমন জানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। গোল গোল সরল চোখ দুটি পাকিয়ে তাকায়। আলি কেনান ইত্যবসরে ভাঁটার মতো জ্বলজ্বলে চোখ দুটো লোকটার চোখের ওপর স্থাপন করে আরো জোরের সাথে উচ্চারণ করে, কইলাম না তর বাপরে একটা ট্যাহা দিয়া দে।

লোকটা বোধহয় সারারাত লঞ্চে ঘুমোতে পারেনি। চোখেমুখে একটা অসহায় অসহায় ভাব। অথবা এমনও হতে পারে কোর্টে তার মামলা আছে। যাহোক লোকটি দ্বিরুক্তি না করে ডান হাতের প্রায় ছিঁড়ে যাওয়া ব্যাগটা বাঁহাতে চালান করে পকেট থেকে একখানা এক টাকার মলিন বিবর্ণ নোট বের করে আলি কেনানের হাতে দিয়ে ফুটপাত ধরে হেঁটে চলে যায়। আলি কেনানের জীবনের এই প্রথম ভিক্ষাবৃত্তি। তাতে আশানুরূপ সফল হওয়ায় শরীরে মনে একটা তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। শুধুমাত্র একটা ধমকের জোরে পরের পকেট থেকে টাকা বের করে আনা যায়, আলি কেনানের জীবনে এটা একটা অভিনব ঘটনা। সেদিন থেকেই তার জীবনে নতুন একটা অধ্যায়ের সূত্রপাত হল।

আলি কেনান গত দুদিন ধরে কিছু খায়নি। শহরের কলের পানি ছাড়া ভাগ্যে তার অন্য কোনো বস্তু জোটেনি। গত তিন মাস থেকে চম্পানগর লেনের একটি হোটেলে সে সকালের নাশতা এবং দুবেলার খাবার খেয়ে আসছিল। প্রথম দুমাস সে নগদ পয়সা দিয়ে খেয়েছে। সেই সুবাদে হোটেল-মালিকদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। হোটেল-মালিক মানুষটি ভালো। দিলে তার রহম আছে। আলি কেনানকে পুরো একটা মাস বাকিতে নাশতা এবং খাবার সরবরাহ করেছে। কিন্তু পুরো এক মাস পার হওয়ার পরও যখন আলি কেনান একটা পয়সা উপুড় করতে পারল না, হোটেল-মালিক জানিয়ে দিল, সে গত এক মাসের টাকা আল্লার ওয়াস্তে লিল্লাহ দিয়েছে বলে ধরে নেবে। কিন্তু আরেকটা বেলাও তাকে খাওয়াবার ক্ষমতা হোটেল-মালিকের নেই।

বিপদ কখনো একা আসে না। আলি কেনান ঘুমোত চম্পানগর লেনেরই একটি মেসে। সেই মেসে বোর্ডারের সংখ্যা ছিল দশ-বারোজন। তাদের কেউ প্রেসের কম্পোজিটর, কেউ কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ী, ফেরিঅলা, দোকান কর্মচারী এমনকি একজন ঠেলাগাড়ির চালকও ঐ মেসের সম্মানিত সদস্য ছিল।

এই সমস্ত মানুষের প্রতি আলি কেনানের সীমাহীন অবজ্ঞা। কপালের ফের, তাকে এইসব মানুষের সাথেই দিন কাটাতে হচ্ছে। মেসের একত্রিশ টাকা আট আনা ভাড়া সে প্রথম দুমাস নিয়মিতই পরিশোধ করেছে। কিন্তু তৃতীয় মাসে তার অবস্থা ভয়ংকর শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। পয়সার অভাবে মুখের দাড়িটা কাটাতে পারে না, জামাকাপড় পরিষ্কার করতে পারে না। তার চেহারাটাও বনমানুষের মতো হয়ে গেল। মেসের সদস্যরা প্রতিদিন টাকা দাবি করে, সে দিতে পারে না। একটা বাজে অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল সে। একদিন ঠেলাঅলাটি বিরক্ত হয়ে বলল,

কী মিয়া বাই, অমন হাতির পারা গতর লইয়া বইয়া বইয়া দিন কাটান। আপনের শরমও করে না। লন আগামীকাল থেইক্যা আমার লগে গাড়ি ঠেলবেন। একতিরিশ ট্যাহা আট আনা ভাড়া আমি দিমু।

কথাটা শুনে আলি কেনানের পায়ের তলা থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠেছিল। হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে মেসের অন্য সকলের সামনেই ঠেলাঅলাকে একটা চড় দিয়ে বসে। তার ফল আলি কেনানের জন্য ভালো হয়নি। তাকে তো উলটো মার খেতেই হয়েছে, তদুপরি বিছানা বালিশ বেঁধে নিয়ে সে-রাতেই মেস ত্যাগ করতে হয়েছে। শহরে তার যাওয়ার মতো কোনো জায়গা ছিল না। দু-দুটো রাত বাধ্য হয়ে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে ঘুমোতে হয়েছে। বাঘের মতো মশার কামড় খেয়ে আলি কেনান তার সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এসে পৌছেছিল। শরীর নড়াচড়া করার বিশেষ শক্তি ছিল না। পুরো দুটো দিন পার্কে বসে গালে হাত রেখে আপন দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে হয়েছে। একী জীবন হয়েছে আলি কেনানের! দুদিন পেটে দানাপানি পড়েনি। তৃতীয় দিনে অন্য কোনো উপায়ান্তর না দেখে প্রথমেই যে-মানুষটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, তার কাছেই একটা টাকা দাবি করে বসল।

তখন চলছিল উনিশশো ঊনসত্তর সাল । আধঘন্টা মুখে ফেনা তুলে চিৎকার করে একটা সিকি পাওয়া গেলে ভিখিরি মনে করত আকাশের চাঁদ পাওয়া গেছে। অথচ আলি কেনান মাত্র একটা ধমকের জোরে একজন অচেনা অজানা মানুষের পকেট থেকে আস্ত একটা টাকা বের করে আনতে পারল, তার জীবনের যাবতীয় দুর্ভাগ্যের মধ্যেও এটা একটা সান্ত্বনার বিষয় বটে। কী একখানা সুন্দর জীবন ছিল আলি কেনানের। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সে যখন অতীতের তুলনা করে, আলি কেনান ভাবে বাবা আদমের মতো তাকেও স্বর্গ থেকে এই কষ্টের দুনিয়ায় ছুড়ে দেয়া হয়েছে। আলি কেনান থাকত আলিশান বাড়িতে। সে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের

তৎকালীন গভর্নর সাহেবের একেবারে খাস পিয়ন। নামে পিয়ন বটে, কিন্তু দাপট ছিল ভীষণ। গোটা গভর্নর হাউজে মাননীয় গভর্নরের পরে আলি কেনান ছিল সবচাইতে শক্তিশালী মানুষ। তার কাছ থেকে ছাড়পত্র না পেলে কারো পক্ষে গভর্নর সাহেবের কাছে পৌছার অন্য কোনো পথ ছিল না। আলি কেনানের নাম সেই সময়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিভিন্ন মহলে রীতিমতো কল্পনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আলি কেনান সুন্দর চেহারার মানুষ ছিল না। গলার আওয়াজটি ছিল ভীষণ কর্কশ। তার চেহারাসুরত কথাবার্তায় কোনো লালিত্য, কোনো কোমলতার লেশ পর্যন্ত ছিল না। তাকে ডাকাতের মতো দেখাত। সাধারণত সে হাসত না। হাসতে দেখলে মনে হত ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে ইতরতা প্রকাশ পাচ্ছে। আলি কেনানের মতো এমন একজন মানুষ কোন বিশেষ গুণে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের এমন পেয়ারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা একটা রহস্য হয়ে উঠেছিল। কেউ কেউ তাকে নব্য রাশপুটিন বলে মনে করত।

আলি কেনান সম্পর্কে নানাজনে নানা কথা বলতেন। তার মধ্যে যে গল্পটি সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছিল সেটি এরকম:

একবার গভর্নর সাহেব ভোলা শহরে মিটিং করতে গিয়েছিলেন। মফস্বলের ছোট্ট মহকুমা শহর । লঞ্চকে পাড়ে ভেড়ানোর মতো কোনো জেটি ছিল না। লঞ্চকে নদীর একরকম মাঝখানে থামতে হত। যাত্রীরা নৌকোয় করে ডাঙায় পৌছত। মহকুমা প্রশাসন গভর্নর সাহেবের মতো মানুষের জন্য ওকূলে নামার কোনো ভদ্র ব্যবস্থা করতে পারল না। তাই লঞ্চ থেকে গভর্নর সাহেবকেও একটি বড়সড় নৌকোয় উঠে যেতে হল। তিনি একা ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে ভোলা থেকে নির্বাচিত মাননীয় গণপরিষদ সদস্যও ছিলেন। সদস্য সাহেব রোদ চড়া থাকায় গভর্নর সাহেবের মাথার ওপর ছাতা মেলে ধরেছিলেন। সেটা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির

কাল। রাজনৈতিকভাবে গভর্নর সাহেবের দিনকাল খুব সুবিধের যাচ্ছিল না। সর্বত্র সরকারবিরোধী আন্দোলন বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল। এই ভোলা শহরেও তাঁকে বাধা দেয়ার জন্য এত মানুষ সমবেত হতে পারে, সেকথা আগাম চিন্তা করলে তিনি একটু প্রস্তুতি গ্রহণ করেই আসতেন। তিনি তো লঞ্চ থেকে নেমে তীরের দিকে যাচ্ছেন। তীরে তাঁকে বাধা দেয়ার জন্য এত জনতা সমবেত হয়েছে, মানুষের সেই জমায়েত দেখে মহকুমা শহরের অল্পস্বল্প পুলিশের ভয়ে জড়োসড়ো অবস্থা। তারা জনগণের আক্রমণ থেকে গভর্নর সাহেবকে উদ্ধার করার বদলে নিজেরা কীভাবে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে, সে প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। ওদিকে গভর্নর সাহেব নৌকায় উঠে বসেছেন। ডাঙার মানুষ বাঁশ, কাঠ, ইট-পাটকেল যা হাতের কাছে পাচ্ছে গভর্নর সাহেবের নৌকোর দিকে ছুড়ে মারছে। ভোলাতে গভর্নর সাহেবের নিজের দলের মানুষ কম ছিল না। ওই প্রাণ বাঁচানোর দায়ে তাদেরও নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে হচ্ছিল। মহকুমা হাকিমের করবার কিছু ছিল না। তিনি গুলি করার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কাই ছিল বেশি।

গভর্নর সাহেব তো নৌকায় উঠেছেন। ডাঙা থেকে অবিরাম ইট-পাটকেল ছুটে আসছে। লঞ্চে ফেরত যাবেন সে উপায়ও নেই । মাঝিমাল্লারাও সবাই জখম হয়ে গেছে। এক পর্যায়ে কপালে একটা ভাঙা ইট লেগে তিনি নিজেও জখম হয়ে গেলেন। কারো কারো মতে তিনি নদীতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। গণপরিষদের সদস্য সাহেব ভোলায় মানুষ। গাঙ তাঁর কাছে পান্তা ভাত। ছাতাটা ফেলে দিয়ে মাত্র একটা ডুব দিয়ে মাথা বাঁচাতে তাঁর কোনো কষ্টই হয়নি। সেইদিনই গভর্নর সাহেবের সলিলসমাধি ঘটেযেতে পারত।

আলি কেনানরা তিন ভাই মাছধরা ডিঙিনৌকায় চড়ে ঘরে ফিরছিল। গভর্নর সাহেবের এত বড় বিপর্যয় দেখে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তাদের ডিঙিতে উঠিয়ে নেয়। তারপর জনতার ইট-পাটকেল অগ্রাহ্য করে ত্বরিৎগতিতে নৌকা চালিয়ে গভর্নর সাহেবকে কোলে করে ডাঙায় নামায় এবং পুলিশবেষ্টনীর ভেতর নিয়ে আসে। গভর্নর সাহের ফেরার সময় আলি কেনানকে সঙ্গে করে ঢাকায় নিয়ে আসেন। ঢাকায় এসে ভোলার সমস্ত পুলিশ অফিসারকে বরখাস্ত এবং মহকুমা হাকিমের বদলির নির্দেশ দিয়ে বসেন। আর আলি কেনানকে খাস পিয়ন হিসেবে গভর্নর হাউজে পাকাপোক্তভাবে বহাল করেন।

সেই থেকে আলি কেনান গভর্নর সাহেবের প্রিয় সখা, পিয়ন যা-ই বলা হোক না কেন, সবচাইতে সর্বশক্তিমান ব্যক্তির দ্বিতীয় সত্তা হিসেবে ষোলোকলায় বাড়তে থাকে। গভর্নর নহের মফস্বলে সফরে যাওয়ার সময় তাঁর বাক্সপেটরা গুছিয়ে দিত আলি কেনান। পানের সঙ্গে জরদা এবং জয়পুরি মশলা ঠিকমতো নেয়া হয়েছে কি না সে হিসেব রাখত গভর্নর হাউজে বেয়ারা, খানসামা, আরদালির অন্ত ছিল না। কিন্তু আলি কেনানের পজিশন ছিল আলাদা। তার ডাকে সবাই বলির পাঁঠার মতো থরথর করে কাঁপত। সে গভর্নর সাহেবের খাওয়ার সময় ঠায় দাঁড়িয়ে সাহেবের খাওয়া দেখত।

গভর্নর সাহেব অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য আলি কেনানকে খেতে দিতেন।

আলি কেনান গভর্নর সাহেব ঘুমোলে তাঁর ব্যক্তিগত টেলিফোন কলগুলো রিসিভ করত। কোনো কারণে সাহেবের মন খারাপ থাকলে বা মেজাজ খিঁচড়ে গেলে টেলিফোনের অত্যাচার থেকে তার নির্জনতা রক্ষা করাও তার একটা দায়িত্ব ছিল। গভর্নর সাহেবের হামসায়াদের মধ্যে কেউ আলি কেনানকে বিশেষ পছন্দ করত না। গভর্নর সাহেবের একটি বাঁকা বাঁশের লাঠি ছিল। সেটিকেও ঘনিষ্ঠদের

অনেকে মনে করতেন একেবারে বেমানান। লাঠিটির কোনো ছিরিছাঁদ ছিল না। অনেক সময় ভিখিরিরাও এ ধরনের লাঠি ব্যবহার করে। বন্ধু বান্ধবেরা মনে করতেন গভর্ণর সাহেবের লাঠিটি অধিক সুন্দর এবং সুগঠিত হওয়া উচিত। সোনারুপোর কারুকার্যমণ্ডিত চন্দন কাঠের লাঠি হলেই গভর্ণর সাহেবের জন্য মানানসই হয়। এরকম একটি লাঠি সগ্রহ করে দেয়ার অঢেল মানুষ ছিলো। গভর্ণর সাহেব ইচ্ছে করলেই এরকম একটা লাঠি আপনি এসে হাজির হতো। কিন্তু তাঁকে সে ইচ্ছে কখনো প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। দু একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, অবসর মুহূর্তে এদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি তাদের ধন্যবাদ দিয়ে একটি গল্প শুনিয়ে দিয়েছেন। গল্প নয় আসলে সত্য ঘটনা। গভর্ণর সাহেবের ওকালতি জীবনের মাঝামাঝি সময়ে এই বাঁশের লাঠির গুণে একবার বিষধর সাপের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। লাঠিটিকে যেমন তেমনি আলি কেনানকেও মানুষ গভর্নর সাহেবের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হিসেবে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আলি কেনান যত কর্কশ এবং রূঢ়ভাষী হোক না কেন তার বিষয়ে ইজ্জত সম্মান মান অপমানের প্রশ্ন উত্থাপনের কোনো প্রশ্নই হয় না।

ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি, ক্যাবিনেটের মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ আমলা, দলের নেতা, উপনেতা সকলের সঙ্গেই সে তেজের সঙ্গে তার ভোলার আঞ্চলিক ভাষাটিতেই সওয়াল-জওয়াব করত। তার ঔদ্ধত্য কতদূর বেড়ে গিয়েছিল— সে সম্পর্কেও একটা কাহিনী সর্বস্তরে পরিচিতি লাভ করেছিল। নানা জিভের ঘষায় মূল কাহিনীটায় নানা রং লেগেছিল। তবে আসলে যা ঘটেছিল তার হুবহু বয়ান এরকম:

একবার হোম মিনিস্টার ওয়াজির হোসেন গভর্নর সাহেবকে টেলিফোন করেছিলেন। তিনি তখন খাস কামরায় আরাম করছিলেন। আলি কেনান টেলিফোন ধরে জিগগেস করল,

হ্যালো কেডা কইতাছেন? মন্ত্রী সাহেব মনে মনে বিরক্ত হলেন। তবু বিলক্ষণ জানতেন যে রাজদ্বারে যেতে হলে দ্বারীর লাঞ্ছনা শিরোধার্য করতে হয়। আলি কেনান বলল,

সাব কী কইবার চান কন। হোম মিনিস্টার সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান এবং নরম জবানের মানুষ। তিনি কণ্ঠস্বরে একটু গুরুত্ব আরোপ করে বললেন, আমি হোম মিনিস্টার ওয়াজির হোসেন। বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। তুমি লাইনটা একটু দেবে? আলি কেনান দাপটের সঙ্গে জবাব দেয়,

না সাব অহন কতা অইব না। সাব তিন ঘন্টা মিটিং কইরা হয়রান অইয়া অহন একটু আরাম করবার লাগছেন। কতা অইব না। পরে টেলিফোন কইরেন। হোম মিনিস্টার ফের অনুরোধ করেন, দেখো না বাবা আলি কেনান, কথা বলাটা আমার বড় প্রয়োজন। আপনের প্রয়োজন সাব আপনের লগে। আমি কী করবার পারি। সাব বিরক্ত না করবার কইছেন। হোম মিনিস্টার শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বললেন,

বাবা আলি কেনান তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো না।

এবার আলি কেনান চূড়ান্ত খেপে উঠল,

সাব মিনিস্টার অইছেন আপনে, কিন্তু কুনু বিবেচনা আপনের নাই। আমি আপনের কতা রাখুম কেরে, আপনে কি আমার কতা রাখছেন। চাকরিডা দিছেন আমার ভাগিনারে? যান সাবের লগে কতা অইব না। যা পারেন, করেন গিয়া।

ওয়াজির হোসেন সাহেব আলি কেনানের উদ্ধত ব্যবহার সম্পর্কে রীতিমতো লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। গভর্নর সাহেব কোনো আমলই দেননি। তিনি ওয়াজির হোসেন

সাহেবকে ডেকে বলেছিলেন, ওয়াজির হোসেন সাহেব আপনি আলি কেনানের কথায় কান দেবেন না। সে যে কখন কী বলে আর করে তাঁর কি ঠিক আছে? ব্যাটা এক নম্বরের পাগল। ওয়াজির হোসেন সাহেব গভর্নর সাহেবের কথায় তুষ্ট না হয়ে বলতে যাচ্ছিলেন,

স্যার এভাবে যদি একজন পিয়ন অপমান করে, তবে ...

গভর্নর সাহেব লালচোখ মেলে তাকিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, তবে কি মন্ত্রীগিরি ছেড়ে দেবেন? তারপর কিন্তু ওয়াজির হোসেন সাহেব আর কিছু বলেননি। গভর্নর সাহেবের ভাষায় আলি কেনান ছিল পাগল তবে খুব হিসেবের পাগল। মন্ত্রী সেক্রেটারিদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে অনেক আত্মীয়স্বজনকে সরকারি চাকুরিতে ঢুকিয়ে নিয়েছে। তার আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে লেখাপড়া-জানা যোগ্য কেউ ছিল না। তাই একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাউকে পিয়ন, দারোয়ান, আরদালির ওপরে বসাতে পারেনি। কেবল ফুফাতো বোনের ছেলেটি আই এ পরীক্ষায় ফেল করেছিল। আলি কেনানের রক্ত-সম্পর্কিতদের মধ্যে এই ভাগ্নেটিই ছিল সবচাইতে উচ্চশিক্ষিত। ভালোমতো উপরি পাওনা আছে এরকম একটি কেরানির চাকুরির ব্যবস্থা করবে এটাই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা। মিনিস্টার ওয়াজির হোসেনের দপ্তরে এরকম একটা চাকুরি খালিও ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিনিস্টার গাদ্দারি করায় ভাগ্নেটির চাকুরি হল না। এটা আলি কেনানের একটা বিরাট পরাজয়ও বটে। তার শোধ নিতে আলি কেনান ভোলেনি।

আলি কেনানেরা ছিল সাত ভাই। ভাইদের মধ্যে একামাত্র সে-ই সামান্য লেখাপড়া করেছিল। অন্য ভাইরা চাষ করত। ধান ফলাত পাট ফলাত। আলি কেনান গভর্নর হাউজে বহাল হওয়ার আগেও তাদের সাত সাতটি হাল ছিল। গোটা গ্রামের মধ্যে আলি কেনানের পরিবারটা ছিল সবাচাইতে সম্পন্ন এবং পরাক্রমশালী। তাদের

হালের বলদগুলো ছিল মোটা এবং তাজা। লোক দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। চর অঞ্চলে তাদের নিবাস। সেখানে খুন জখম দাঙ্গা হাঙ্গামা এসব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জরু এবং জমির মধ্যে মানুষ জরুর চাইতে জমিকে অধিক মূল্য দিত সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যার লাঠির জোর বেশি চরের জমি তার দখলে থাকবে এটা দীর্ঘদিনের অলিখিত কানুন।

আলি কেনানেরা ছিল সাত ভাই। চাচাতো জ্যাঠাতো মিলিয়ে এক ডাকে পঞ্চাশজনের মতো জোয়ান মরদ তারা বের করে আনতে পারত। যেদিকে যেত সবকিছু কেটে চিরে ফাঁক করে ফেলত। নিজেদের গ্রামে নয় শুধু, আশেপাশের গ্রামের মানুষও তাদের চর অঞ্চলের ত্রাস মনে করত। আলি কেনানেরা সাম্প্রতিক দাঙ্গায় দুজন মানুষকে কুপিয়ে খুন করেছে। কিন্তু সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে দারোগাকে ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করতে হয়েছে।

আলি কেনানের চাকুরিপ্রাপ্তির সুযোগে তার আত্মীয়স্বজনের প্রতাপ গ্রামে হাজার গুণ বেড়ে গেল। কারো টু শব্দটি করার জো রইল না। আলি কেনান ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রীকে ধরে বিলকে বিল সরকারি খাসজমির বন্দোবস্ত নিয়ে ফেলল। আগেও তারা জোরে জবরে এসব জমি ভোগদখল করত। তবে কাজটি অত সোজা ছিল না। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে দখল নিতে হত। খুন জখম এসব ছিল অনিবার্য ব্যাপার। অপরকে খুন করতে গেলে মাঝে মাঝে নিজেরও খুন হওয়ার ঝুঁকি সইতে হত। থানা-পুলিশ করতে হত। মাঝে মাঝে মামলা হাইকোর্ট অবধি গড়াত।

সরকারি অনুমোদনের বলে কোনো বড় ধরনের ঝুঁকিগ্রহণ ছাড়া তারা বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়ে বসল। তাদের বাধা দেয়ার মতো কোনো শক্তি ছিল না। থানা-পুলিশ মায় মহকুমা হাকিম পর্যন্ত চোখ কান বুজে থাকতেন। গভর্নর হাউজে আলি কেনানের প্রতিপত্তির কথা গ্রামে পঞ্চাশ গুণ বেশি করে প্রচারিত হয়েছে।

সত্যি সত্যি গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল তার পরিবারের বিরাগভাজন হলে আলি কেনান লাটসাহেবকে বলে ফাঁসি পর্যন্ত দেয়ার ক্ষমতা রাখে। গ্রামের লোকের ছিল জানের ভয়, আর আমলাদের চাকুরির। আলি কেনানের বাবা পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হয়ে গেল। চাচাতো জ্যাঠাতো দুভাই মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্য হয়ে বসল। তখন তাদের আর পায় কে? গোটা ইউনিয়নের সালিশ বিচার সবকিছু করার অধিকার আলি কেনানের পরিবারের একচেটিয়া হয়ে গেল। ঢাকার গভর্নর হাউজের অনুকরণে ভোলা মহকুমার তামাপুকুর গ্রামে একটি ক্ষুদ্র ক্ষমতাকেন্দ্র তারা তৈরি করে ফেলল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যেমন ইসলামাবাদে বসে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকর্ম পরিচালনা করতেন, আলি কেনানও তেমনি ঢাকার গভর্নর হাউজে বসে তামাপুকুর গ্রামের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করত।

একবার আলি কেনানের বোনের সঙ্গে কী কারণে তার ভগ্নীপতির ঝগড়া বাধে। বলাবাহুল্য, তাদের সাত ভাইয়ের বোন ওই একটিই এবং সে সকলের ছোট। ভাইয়েরা তাকে ভীষণ আদর করত। পিতৃপরিবারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে বোনটির চোটপাট ভালোরকম বেড়ে গিয়েছিল। একদিন কী কারণে জানা যায়নি ভগ্নীপতি একটা পিড়ি দিয়ে আঘাত করে বোনের মাথাটা ফাটিয়ে দেয়। গ্রামদেশে এই জাতীয় সংবাদ প্রচারিত হতে বেশি সময় নেয় না। শুনে ভাইয়েরা লাঠি-হাতে বোনের শ্বশুরবাড়ির দিকে ছুটে যায় । তাদের বাড়ি অবধি যেতে হল না। বাজারের কাছেই ভগ্নীপতির সাথে মুলাকাত হয়ে যায়। তারা ভগ্নীপতিকে সাপের মতো পেটাতে থাকে। এদিকে বোনের কাছে খবর যায় যে তার ভাইয়েরা এসে সোয়ামিকে পেটাচ্ছে। বোন লাজশরম ত্যাগ করে একেবারে প্রকাশ্য রাস্তায় ছুটে এসে ভাই এবং সোয়ামির মাঝখানে দাঁড়ায়। ভাইদের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেয়। আহত সোয়ামির দিকে তাকিয়ে তার বুঝি একটু দয়া হয়, কিন্তু ভয় দেখাতে ভোলে না।

ভাইজান এই হারামির পুতরে মাইর‍্যা হাত গন্ধ কইর‍্যা কী লাভ। তার বদলে বড় ভাইজানরে একখানা চিঠি লেইখ্যা দেন। ভাইজান লাটসাবরে কইলে সৈন্য আইন্যা হের সাত গুষ্টিরে হাগাইয়া ছাড়ব। আসলেও মানুষ বিশ্বাস করত, আলি কেনান তামাপুকুর গ্রামে সূর্য ওঠাতে আর ডোবাতে পারে।

আলি কেনানের দিনগুলো দিব্যি কাটছিল। এই সময়ে সে গভর্নর সাহেবের মতো দাড়ি রেখে দিয়েছে। একটা জিন্নাহ টুপি কিনে পরতে আরম্ভ করেছে। কালো কাপড় কিনে একটা শেরওয়ানি বানিয়ে নেওয়ার কথাও তার মনে উদয় হয়। কিন্তু অতটুকু সাহস করে উঠতে পারেনি। তা ছাড়াও ইদানীং মনে একটা গোপন বাসনা হানা দিতে আরম্ভ করেছে। সে স্থির করেছে, আগের সে পুরোনো বউ দিয়ে তার চলবে না। সবদিক দিয়ে যোগ্য দেখে তার আরেকটা বিয়ে করা উচিত। সর্বক্ষণ বড় সাহেবের সঙ্গে থাকতে হয় বলে এ আকাঙ্ক্ষাটি তার অপূর্ণ রয়ে গেছে।

সকলের দিন সমান যায় না। আলি কেনান ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে অদুর ভবিষ্যতে নীল নির্মেঘ আকাশে তার জন্য বজ্রপাত অপেক্ষা করছিল। ঘটনাটি আচমকা ঘটে গেল।

আরেকদিন গভর্নর সাহেব দীর্ঘ চারঘন্টা ধরে তাঁর দলের নেতাদের নিয়ে মিটিং করার পর একটু আরাম করে নিচ্ছিলেন। আলি কেনান অন্যান্য দিনের মতো টেলিফোনের গোড়ায় বসে ঝিমুতে ঝিমুতে নতুন বিয়ে করার বিষয়টি চিন্তা করছিল। এমন সময়ে টেলিফোনটা তরুণ বজ্রের মতো চিৎকার করে উঠল। আলি কেনান ভীষণ বিরক্ত হল। আজকাল সে টেলিফোন কল রিসিভ করার সময় ভীষণ বিরক্তি বোধ করে। গভর্নর সাহেবকে টেলিফোন করে যারা তার গভীর ভাবনায় বাধার সৃষ্টি করে, মনে মনে ওদের কুকুরের বাচ্চা বলে গাল দেয় । তবু রিসিভার কানে তুলে জিগগেস করল, কেডা? ওপাশ থেকে গভর্নর সাহেবের পি. এ. জানালেন,

সাহেবকেই তাঁর চাই। আলি কেনান তার চিরাচরিত পেটেন্ট জবাবটাই দিল, বড় সাব আরাম করবার লাগছেন। অহন কতা অইব না।

পি. এ. বলল, অত্যন্ত জরুরি। ইসলামাবাদ থেকে প্রেসিডেন্ট সাহেব কথা বলবেন। আলি কেনান এই পি. এ.টিকে দুচোখে দেখতে পারত না। সে মনে করত তাকে সময়ে অসময়ে বিরক্ত করার জন্যই এই পি. এ. ব্যাটার জন্ম হয়েছে। সে তার গ্রাম্য কূটবুদ্ধি দিয়ে হিসেব করল, প্রেসিডেন্ট সাহেবের টেলিফোন ফেল করিয়ে দিলে পি.এ.ব্যাটার চাকুরি যাবে তার কী!

পি. এ. সাহেব বারবার অনুরোধ করে আলি কেনানকে রাজি করাতে না পেরে সমস্ত প্রটোকল ভেঙে গভর্নর সাহেবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর তো চাকুরি এবং ঘাড় দুটো বাঁচানো প্রয়োজন । তিনি অনেকটা চিৎকার করেই ঘোষণা করলেন,

স্যার ইসলামাবাদ থেকে প্রেসিডেন্ট সাহেবের কল। গভর্নর সাহেব পাজামার রশিটি খুলে দিয়ে দিবানিদ্রা উপভোগ করছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহেবের কল শুনেই হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পাজামার রশি বাঁধার কথাটিও ভুলে গিয়েছেন। তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে নিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁকে কর্তব্যে গাফিলতির জন্য অনেকক্ষণ ধরে উর্দু পশতু এবং ইংরেজি মিশিয়ে চোদ্দপুরুষ তুলে গাল দিলেন। গভর্নর সাহেব থেমে থেমে 'মাই প্রেসিডেন্ট যেয়াদা কসুর হো গয়া' শব্দকটি উচ্চারণ করলেন। আর ওপাশ থেকে অজস্র ধারায় গালাগালির স্রোত প্রবাহিত হতে থাকল। ঘন্টাখানিক পরে টেলিফোন রেখে গভর্নর সাহেব পি.এ.-কে তলব করলেন। পি. এ. তাঁর সামনে এসে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে থাকে। সাহেবের মেজাজ তখন সপ্তমে। তিনি কৈফিয়ত দাবি করে বললেন,

এই কুত্তার বাচ্চা টেলিফোন দিতে এত দেরি করলি ক্যান্। পি. এ. ভদ্রলোক অত্যন্ত নম্র স্বভাবের মানুষ। কেউ কঠোরভাবে কথা বললে যথাসম্ভব মার্জিত জবাব দেয়াটাই তাঁর অভ্যেস। তিনি বললেন, স্যার আমি প্রথম থেকেই আলি কেনানকে অনুরোধ করে আসছিলাম। সে বারবার বলেছে আপনাকে ডেকে দিতে পারবে না। তাই শেষ পর্যন্ত আপনার বেডরুমে ঢুকে পড়তে হল। স্যার এ বেয়াদবি মাফ করে দেবেন।

আচ্ছা তুমি যাও এবং এ. ডি. সি.-কে আসতে বলো। এ. ডি. সি. এলে গভর্নর সাহেব রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে নির্দেশ দিলেন,

এই কুত্তার বাচ্চা আলি কেনানকে এক্ষুনি ঘাড় ধরে বের করে দাও। সংক্ষেপে এই হল আলি কেনানের স্বর্গ থেকে পতনের কাহিনী।

২

সেদিন সন্ধেবেলা গভর্নর হাউজ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আলি কেনানের মনে হল বিগত একটা বছরের জীবন যেন স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছে। সে ছিল ভোলার তামাপুকুর গ্রামের এক অখ্যাত অভাজন আলি কেনান। গভর্নর হাউজের সুউচ্চ গম্বুজের দিকে তাকিয়ে তার অবাক লাগে কী করে এই আলিশান অট্টালিকায় প্রবেশ করে গভর্নর সাহেবের সবচেয়ে পেয়ারের মানুষ হয়ে উঠেছিল। গল্পের মতো মনে হয়, স্বপ্নের মতো লাগে।

তার সেদিনটির কথা মনে পড়ে গেল; যেদিন গাঙের গভীর পানি থেকে পাঁজাকোলা করে ডুবন্ত গভর্নর সাহেবকে ডিঙিতে উঠিয়ে নিয়েছিল। আলি

কেনানের তিন ভাই যদি সেদিন জানের ঝুঁকি নিয়ে গভর্নর সাহেবকে বাঁচাতে ছুটে না আসত ওই গাঙের পানিতেই তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হত। আজ একথা কে বিশ্বাস করবে! ওই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর সাহেব তাকে চূড়ান্ত অপমান করে এক কাপড়ে বলতে গেলে একরকম উলঙ্গ অবস্থায় শহরের মাঝখানে ময়লা আবর্জনার মতো ছুড়ে দিলেন। হায়রে আল্লা তোমার রাজ্যে এত অবিচার! আর মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হতে পারে!

এখন আলি কেনানের প্রধান সমস্যা সে যাবে কোথায়? ভোলায় নিজ গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে এসেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখে তার শিরার রক্ত চলাচল একরকম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। হ্যাঁ সে ভোলায় ফিরে যেতে পারে বটে। আর যদি ফিরে যায় মানুষ কাল হোক, পরশু হোক একদিন জেনে যাবে লাটসাহেব তাকে পাছায় লাথি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? তার ভাই বেরাদরেরা যেসকল মানুষকে বিপদে ফেলেছে, শাস্তি দিয়েছে তারা তো আর বসে থাকবে না। আলি কেনানের সমস্ত কীর্তি তার চোখের সামনে খসে খসে পড়বে। সমস্ত জমিজমার পালটা দখল শুরু হয়ে যাবে। দুজন মানুষের লাশ তারা চরের মধ্যে পুতে রেখেছে। তারা জ্যান্ত হয়ে বদলা দাবি করবে। থানায় দারোগা, খাসমহালের কর্মচারী, মহকুমার এস.ডি.ও. এতকাল অনন্যোপায় হয়ে আলি কেনানের আবদার দাবি পূরণ করতে এগিয়ে এসছে। এখন সকলে পিঠ ফিরে দাঁড়াবে। আলি কেনান স্পষ্ট দেখতে পায় তার সৌভাগ্যের নক্ষত্র ডুবে গেছে। এখন তামাপুকুর গ্রামে ফিরে যাওয়া মানে একপাল নেকড়ের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ানো। ভোগান্তিটা যদি শুধু একা আলি কেনানের হত কোনো কথা ছিল না। আলি কেনান জানে পুরুষের ভাগ্য এরকমই। কিন্তু সে চোখ মেলে দেখতে পারবে না তার বুড়ো বাপকে গ্রামের মানুষ অপমান করছে, ভাইদের কোমরে দড়ি পড়ছে, চাষের জমি বেহাত হয়ে যাচ্ছে। অসহায়ের মতো

এসব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার বদলে আলি কেনানের মরে যাওয়া অনেক ভালো। তা ছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। আলি কেনান নিজেকে এতদিন পরিবারের সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করে এসেছে। আজকে দুর্ভাগ্যের জ্যান্ত প্রতিমূর্তি হিসেবে কীভাবে আত্মীয়স্বজনের সামনে কালোমুখ দেখাবে। তার বদলে আলি কেনানের পক্ষে চলন্ত ট্রেনের নিচে আস্ত শরীরখানা পেতে দেয়া অনেক সহজ হবে। আলি কেনান যেই মায়ের পেটে নমাস ছিল সেখানে যেমন ফেরত যেতে পারে না, তেমনি পারে না ভোলার তামাপুকুর গ্রামে ফিরে যেতে। আত্মীয়স্বজনদের অনেককেই সে ঢাকা শহরে পিয়ন দারোয়ানের চাকুরিতে বহাল করেছে। ওদের কারো কাছে যাওয়ার কথা তার মনের ধারেকাছেও ঘেঁষেনি। কেননা তাদের কাছে আলি কেনানের পজিশন ছিল গভর্নর সাহেব নন, স্বয়ং আইয়ুব খানের মতো। সুতরাং ওদের কাছেও সে যেতে পারে না। গভর্নর হাউজে জন্মানো খোলস পরিবর্তন করে নতুন খোলস জন্মাতে মোটমাট তিন মাসের মতো সময় লেগেছে। এরই মধ্যে আলি কেনান মেসে বসবাস করেছে। সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে ঘুমিয়েছে। শহরের পার্কে বসে বসে আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করেছে । কিন্তু আজ লঞ্চ থেকে নামা যাত্রীর কাছ থেকে টাকাটি আদায় করতে পারায় আলি কেনানের চোখে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন ভিড় করে।

আলি কেনানের মতো মানুষ ভাঙবে অথচ মচকাবে না। পৃথিবীতে এখনো বাঁচবার যথেষ্ট উপায় আছে। তার জামাকাপড় একদম ছিঁড়ে গিয়েছিল। গভর্নর সাহেবের অনুকরণে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো সুন্দর করে দাড়ি রাখতে আরম্ভ করেছিল। আজ শখ, বিলাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো তাকে মুখ-ভ্যাংচাতে আরম্ভ করেছে। মুখে দাড়ির জঙ্গল হয়ে গেছে। জামাকাপড় ছিঁড়ে এমন এক দশা হয়েছে ইচ্ছা করলে আলি কেনান এখন ভিখিরিদের সারিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। একটি পানের দোকানের আয়নায় আলি কেনান আরেকবার তার চেহারাসুরত ভালো করে

দেখে নিল। ময়লা ত্যানা পাজামা পাঞ্জাবি, মুখে একমুখ দাড়ি, উষ্কখুষ্ক জটবাঁধা মাথায় চুল, আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি সব মিলিয়ে তাকে পাকা দরবেশের মতো দেখাচ্ছে। নিজেকে ঠিক ভিখিরি হিসেবে কল্পনা করার চেয়ে অনেক ভালো। একবার নিজের সম্পর্কে যখন নিশ্চিত হল, কোত্থেকে সাহস এসে তাকে নতুন জীবনের পথে ছুটিয়ে নিয়ে গেল।

চোখের সামনে যে রেস্টুরেন্ট পড়ল, সরাসরি ঢুকে গেল। টেবিলে একটা থাবা দিয়ে বেশ গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করে বসল,

দে তোর বাপরে একটা ট্যাহা দিয়া দে। আলি কেনান তার চোখদুটি ক্যাশে বসা লোকটির চোখের ওপর রাখল। মানুষটি বেশ লম্বাচওড়া, মাথায় কিস্তিটুপি এবং মুখে চিকন করে কাটা দাড়ি। লোকটি একটা বাক্যও উচ্চারণ না করে ক্যাশ খুলে একটা টাকা তার হাতে দিল। আলি কেনানের হাত কাঁপছিল। পা টলছিল। শরীরের অবাধ্য স্নায়ুর আন্দোলন থামাবার জন্য তাকে কিছু একটা করতে হবে। তাই বলল,

আল্লাহ্ তরে অনেক দিব।

এভাবে প্রথম দিনেই সে তেরো টাকা সংগ্রহ করে ফেলল। প্রথম দিনের আদায় হিসাবে মন্দ না। সব দোকানদার দেয়নি। তার জন্য আলি কেনান দোকানদারদের দোষ দেয় না। নিজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে দায়ী করে। সে খতিয়ে খতিয়ে হিসেব করে তার গলার আওয়াজটা অস্বাভাবিক রকমের দুর্বল ছিল। প্রয়োজনীয় জোর সে প্রয়োগ করতে পারেনি। কিংবা দোকানে এত ভিড় ছিল যে তার আওয়াজ মালিকের কানে পৌঁছুতেই পারেনি। কালে কালে এসকল ছোটখাটো দোষত্রুটি সংশোধন করে নেয়া যাবে। মানুষ তো তাকে টাকা দেয়ার জন্য বসেই আছে। সে নির্দেশ দিতে জানে। এমন নির্দেশ দিতে হবে যাতে অন্তরাত্মা পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলতে পারে।

আলি কেনানের সৃজনীশক্তি আছে, একথা স্বীকার করতে হবে। সে ভেবে দেখল এই দরবেশি জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার মতো একটা আশ্রয়ও খুঁজে বের করতে হবে। কথায় বলে আস্তানা না পেলে মস্তান হয় না। ফুলতলির ওদিকে গতকাল সে একটা বাঁধানো কবর দেখেছে। চারপাশের দেয়ালের ঘেরটা বেশ বড়। অনায়াসে একজন মানুষের ঘুমনোর পক্ষে যথেষ্ট। ঝড়বৃষ্টি হলে অসুবিধে হতে পারে। হ্যাঁ তা একটু হতে পারে বৈকি। তবে এখন আশ্বিন মাস। নীল নির্মেঘ আকাশ, আরামসে আলি কেনান এখানে রাত কাটাতে পারে। আর ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় কালে কালে একটা চালা উঠিয়ে নেয়া অসম্ভব নাও হতে পারে। সেই রাত থেকে আলি কেনান ফুলতলির কবরে বসবাস আরম্ভ করে দেয়। যারা দেখেছে একআধটু কৌতূহলী হয়ে তাকিয়েছিল, কোনো প্রশ্ন করেনি। এ ধরনের ঘটনা তো হামেশাই ঘটে। দরবেশ ফকির ওরা তো সবখানে মাটি ফুঁড়ে জন্মায় আর মানুষ তাদের মেনে নিতে অভ্যস্ত। একটা বখাটে ছেলে শুধু বলেছিল,

দরবেশ বাবা যতদিন ইচ্ছা থাকবার পারবা, আমারে মাসে মাসে পঁচিশ ট্যাহা খাজনা দেওন লাগব। আগেবাগে কয়্যা রাখলাম।

তুই কুন গাঞ্জাখোর বেটা ট্যাহা চাস ? আলি কেনানও সমান তেজের সঙ্গে জবাব দিয়েছে, না ঠেকলে চিনবার পারবি না আমি কে?

ছেলেটি প্রায় তেড়ে এসে বলেছিল, তোর দরবেশগিরি পাছা দিয়া ভইরা দিমু। এইহানে থাকতে অইলে মাসে মাসে পঁচিশ ট্যাহা দেওন লাগব। এ নিয়ে আলি কেনানের সঙ্গে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। আরেকটি যুবক হস্তক্ষেপ করায় অধিক দূর গড়াতে পারল না। হাত ধরে ছেলেটিকে নিবৃত্ত করে বলল, ‘আবে কালাচান, আল্লাহ্ কার ভিতর কী মাল ভইরা থুইছে কইবার পারবি?’

এটা তো নতুন কোনো কথা নয়, চোরগুন্ডারা ফকির দরবেশকে বেশি ভক্তি করে সুতরাং আলি কেনান ফুলতলির বাঁধানো কবরটিতে পাকা ঠিকানা পেতে বসল। আলি কেনানের বিচরণক্ষেত্র অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছে। কোনো কোনো দিন সে বাংলাবাজার সদরঘাট অঞ্চলে টাকা তুলতে যায়। কোনোদিন ইসলামপুর, আবার কোনোদিন নওয়াবপুর। টিপু সুলতান রোড হয়ে নারিন্দা অবধি সমস্ত এলাকাটিকে সে তার নিজের জমিদারি বলে মনে করতে আরম্ভ করেছে। এককেটি এলাকায় সে পনেরো দিন অন্তর একবার দর্শন দেয়। পূর্বের মতো টেবিলে থাবা দিয়ে বলতে হয় না, "তর বাপরে একটা ট্যাহা দিয়া দে।" এখন তার দাবি করার পদ্ধতিটাও অনেক সহজ হয়ে এসেছে। সে শুধু তার উপস্থিতিটুকু জানিয়ে দেবার জন্যে উচ্চারণ করে, তর বাপরে ...। বাক্য ব্যয় না করে দোকানদার একটি টাকা এগিয়ে দেয়। কেউ কেউ বেশিও দেয়। সে আপত্তি করে না, কিন্তু এক টাকার কম অর্থ আলি কেনান গ্রহণ করে না।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। আলি কেনানের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। সে কবরে চার কোণে চারটি ত্রিকোণাকার লাল নিশান টাঙিয়েছে। কবরটিকে আপাদমস্তক লালশালুতে ঢেকে দিয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালায়। কবরের এই আকস্মিক শ্রীবৃদ্ধিতে কিছু-কিছু গাঁজাখোর, চন্ডুখোর ভিড় করতে আরম্ভ করেছে। আলি কেনান লালশালুর একটা লুঙ্গি এবং একটা আজানুলম্বিত আলখাল্লা বানিয়ে নিয়েছে। গলায় বড় বড় দানার কাঠের মালা পরেছে। দুটি লোহার শেকল কাঁধের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে কোমর অবধি ঝুলিয়ে দিয়েছে। এখন মাঝে মাঝে তার জজবার ভাব হয়। সে সময়ে আলি কেনান অনেকটা ভাবের আবেশে কি গাজার নেশায় বলা মুশকিল, গেয়ে ওঠে:

হেই মানুষ জনম গুনাহগার

ভবনদী কেমনে দিবি পার

সময় থাকতে গুরুর পন্থা ধর

বাবা বু আলি কলন্দর

বাবা বু আলি কলন্দর

একদিন আলি কেনান লক্ষ করে একটা কুকুরছানা কুঁইকুঁই করে কবরের চারপাশে ঘুরছে। পয়লা তার ইচ্ছে হয়েছিল হারামজাদা কুত্তার বাচ্চাটার একটা ঠ্যাং ল্যাংড়া করে দেয়। কুত্তার বাচ্চার দুঃসাহস তো কম নয়। পরক্ষণে তার মনে একটা মৌলিক ভাবনা জন্মায়। জখম না করে কুকুরছানাটিকে একটুকরো পাউরুটি খেতে দেয়। এভাবে দু- চারদিন যেতে-না-যেতে কুকুরছানাটি তার ভীষণ ন্যাওটা হয়ে পড়ে। প্রতিদিন সে নদীতে গোসল করতে যাওয়ার সময় কুকুরছানাটিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। আপন হাতে রগড়ে রগড়ে সারা গা পরিষ্কার করে। একদিন বাজার থেকে লাল এবং সবুজ রঙের গুঁড়ো কিনে আনে। একটা গামলাতে সে রং ভালো করে গুলে নিয়ে কুকুরছানাটির পিছনের দিকে সবুজ এবং সামনের দিকে লাল রং লাগিয়ে দেয়। তখন শিশুকুকুরটিকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাতে থাকে। আলি কেনান একদৃষ্টে নিজের শিল্পকর্মের দিকে তাকিয়ে থাকে। আশ মেটে না। আবার দোকানে গিয়ে সুন্দর পেতলের শিকল এবং ঘন্টি কিনে আনে। চামড়ার বেল্টের সঙ্গে জুড়ে আটটি ঘন্টি গলায় ঝুলিয়ে দেয়। কুকুরটি চলতে ফিরতে টুং টুং আওয়াজ করে। এই ছোট্ট শিশুজন্তুটির এতসব ছলাকলা দেখে আলি কেনানের আনন্দ আর ধরে না।

একদিন আদায়ে বের হবার সময় কুকুরছানাটিকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। এই বিচিত্র জন্তু দর্শন করে শহরের শিশুরা তার পিছুপিছু অনুসরণ করে, হাততালি দেয়। দেখা গেল কুকুরছানা নিয়ে যাওয়ার একটা বাস্তব সুবিধেও আছে। দোকানদারদের আর “তর বাপরে...” বলে জানান দিতে হয় না। ঘন্টির শব্দ শুনে সকলে আপনি

মনোযোগী হয়ে ওঠে। আলি কেনান রোজ সকালে একটু বেলা করে কুকুরছানাটি সঙ্গে নিয়ে শহরের পথে হেঁটে যায়। টুং টুং ঘন্টির আওয়াজ হয়, লোকজন পিছন পিছন হল্লা করে। নতুন একটা চমৎকার জীবন লাভ করে। কুকুরছানাটি মাঝে মাঝে আনন্দে নেচে ওঠে। আলি কেনানের অসম্ভব ভালো লাগে। তবে এই নতুন জীবনের সঙ্গে গভর্নর সাহেবের জীবন বিনিময় করতে সে রাজি হবে না। গর্বে তার চোখে জল এসে যায়। কোনো মানুষের সাহায্য ছাড়া এই নতুন জীবনটিকে আপন প্রাণের ভেতর ফুৎকার দিয়ে মন্ত্রবলে জাগিয়ে তুলেছে।

কিছুদিন পর তার মনে অন্যরকম একটা ভাবনা আসে। এভাবে রোজ রোজ কুকুর নিয়ে ঘুরলে লোকজনের চোখে ওজন কমে যেতে পারে। এতকাল ঘুমের মধ্যে ছিল, এদিকটা সে চিন্তা করেনি। সে অনুভব করল একজন কাউকে প্রয়োজন যে শিকল ধরে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

সেদিন সন্ধেবেলা বাহাদুর শাহ পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে আসছিল। সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। পুরো নওয়াবপুর এলাকাটা চক্কর দিতে হয়েছে। আলি কেনান ভেবেছিল পার্কে ঢুকে একটু জিরিয়ে নেবে। ঢুকেই দেখতে পেল, একটা ছেলে লম্বা হয়ে পাথরের বেঞ্চির ওপর ঘুমিয়ে আছে। পরনের জামাটি শতচ্ছিন্ন। ক্লিষ্ট মলিন মুখ। পেটের চামড়া গিয়ে পিঠে লেগেছে। কতদিন খায়নি কে জানে! এরকম কত ছেলেই তো এভাবে শুয়ে থাকে। আলি কেনান হাঁক দিল, এ্যাই শালা চোর। ছেলেটি ভয়ে ভয়ে শোয়া থেকে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বলল:

মুই চোর নই। মোর বাপ মোর মারে তালাক দিয়া আবার সাঙ্গা বইছে। হের লাইগ্যা মুই বাপের উপর রাগ কইরা চইল্যা আইছি। চাইর দিন কিছু খাই নাই। আন্নে মোর বাবা, মোরে দুগা খাইবার দেন। আলি কেনান জানতে চাইল,

তোর বাড়ি কই শালা?

মোর বাড়ি হাতিয়া। ছেলেটি ভীষণ ভয় পেয়েছে। কিন্তু দুটো খাওয়া পাওয়ার আশাও ছাড়েনি। আলি কেনান বলল,

শালা তুই চোর । ছেলেটি তার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে বলল,

মুই চোর নই। মোর পেটে ভুখ।

আলি কেনান নির্দেশ দিল,

শালা খাড়াইয়া কথা ক। ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়। আলি কেনান তার হাতে কুকুরের শিকলটি ধরিয়ে দিয়ে বলল, শালা চল।

সেদিন থেকে আলি কেনানের পেশায় সহায়তা করার জন্য কুকুরছানার পাশাপাশি একটি মানবশিশুও তার সঙ্গে যোগ দিল।

৩

আলি কেনানের সম্প্রসারণশীল কল্পনা ঝরনাধারার মতো চারদিকে বিকাশ লাভ করতে আরম্ভ করেছে। তার আকাঙ্ক্ষা অনেক। আপাতত সে গুটিকয় খুচরো কাজে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেছে। ফুলতলির বাঁধানো কবরের পাশে একতলা বাঁশের ঘরটি নামমাত্র মূল্যে ভাড়া নিয়ে তাতে পার্টিশন লাগিয়ে একটা হুজরাখানা প্রতিষ্ঠা করেছে। পার্টিশনের অপর পাশে কুকুরছানাসহ ছেলেটি ঘুমায়। এই সমস্ত কাজে খরচ করবার মতো টাকা আলি কেনানের হাতে আছে। উদ্যোগী মানুষকে সবাই সাহায্য করতে আসে। মহল্লার মানুষেরা ইতিমধ্যে নানা ব্যাপারে তার কাজে হাত লাগাতে ছুটে এসেছে। এলাকায় আলি কেনান আসার পর থেকে দৈনন্দিন জীবনযাপনের একঘেয়েমির মধ্যে একটা নতুন হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে।

আলি কেনান নতুন ভাড়া করা ঘরটিতে অভ্যাগতদের বসবার সুবিধের জন্য হোগলার চাটাই পেতে রেখেছে। নানান মানুষ এখন তার কাছে আসে। তারা সেখানে এসে অপেক্ষা করে। সে আনুমানিক সকাল আটটা পর্যন্ত হুজরাখানার মধ্যে কাটায়। আবার সন্ধেবেলাও ঘন্টাখানেক সেখানে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। তখন সে তার নিজের মুখোমুখি হয়। একান্ত একাকিত্বের পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুভব করতে থাকে। আলি কেনানের এই জীবনের স্বাদটাই আলাদা। এখন সে আর কোনো সম্রাটের সঙ্গেও জীবন বিনিময় করতে রাজি হবে না। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, চারদিকে অবারিত স্বাধীনতা। নিজেকে তার সবকিছুর নিয়ন্তা বলে মনে হয়। যত একাকী হয় ততই অনুভব করে সে ঈশ্বরের মতো শক্তিমান। নানা জাতের মানুষ এসে হোগলার চাটাইতে বসে অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করে। সংসারে রোগ-শোক আছে। আছে আশাভঙ্গের বেদনা। আল্লাহতায়ালা মাটি দিয়ে গড়েছেন মানুষ। আর সে মানুষ বড় দুর্বল। প্রতি মুহূর্তে কারো কাছ থেকে ভরসা আদায় করে তাকে বাঁচতে হয়। জীবনসংগ্রামে কাতর মানুষ কোথায় পাবে সর্বক্ষণ জীবনের বোঝা বইবার প্রেরণা। আলি কেনান স্বেচ্ছায় মরণশীল মানুষের বোঝা হালকা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তাই মানুষ আলি কেনানের কাছে আসে। কেউ এসে বলে, তার ছেলেটি বড় হয়েছে, কিন্তু এখনো বিছানায় প্রস্রাব করে। বাবার দোআ চাই। কেউ পেটের শূল-বেদনার প্রতিকার প্রার্থনা করে। কোনো মা চোখের জলে মিনতি জানায়, তার মেয়েটি অত্যন্ত অভাগী। তিন বছর স্বামীর ঘর করেছে, এখন স্বামী নিচ্ছে না। সহায়হীনা বিধবাকে ভরণপোষণ জোগাতে হচ্ছে। বাবা যদি এর একটা বিহিত না করেন বিধবার দাঁড়াবার স্থান নেই।

আলি কেনান সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু তার পরই মুখ দিয়ে অশ্লীল-অশ্রাব্য গালাগালির তুবড়ি ছুটতে থাকে: খানকি মাগি, শাউরের পো' এইসব মধুর শব্দ তার মুখ দিয়ে অবলীলায় বেরিয়ে আসতে থাকে। একেক সময়ে তার

বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার দশা হয়। তখন কারো পাছায় লাথি মারে, কাউকে চুল ধরে ওঠবস করায়। কোনো মহিলাকে একটা পাউরুটির টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে বলে,

নে মাগি এইড্যা খা। যে-বালক বিছানায় প্রস্রাব করে তাকে একটা গ্লাসে ডান হাত ডুবিয়ে পানিটা মুখের কাছে ধরে বলে, নে বানচোত এই পানি খা। আবার বিছানায় মুতলে শালা ল্যাওড়া কাইট্যা ফেলুম মনে রাখিস।

বিচিত্র রকমের মানুষ আসে। আলি কেনান তাদের রোগশোকের বিচিত্র বিধান দেয়। সামান্য সময়ের মধ্যে চারপাশে গুজব রটে যায় যে, আলি কেনানের রোগ সারাবার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে। খবর যত ছড়ায়, তত অধিক হারে মানুষ তার কাছে আসে। আগে তার কাছে বস্তির মানুষ, কাজের বেটি, রিকশাঅলা এইসব নিম্নশ্রেণীর মানুষ আসত। এখন ভদ্রঘরের মানুষ, বিশেষ করে মেয়েছেলেরা তার কাছে আসতে আরম্ভ করেছে। এইসব মহিলা দেখলে তার খুব আনন্দ হয়। আবার পাশাপাশি ঘৃণার একটি কৃষ্ণ রেখা সাপের মতো এঁকেবেঁকে মনের মধ্যে জেগে ওঠে। মাঝে মাঝে তার বলতে ইচ্ছে করে, মাগিরা ব্যারাম সারাইবার কালে আলি কেনান আর মজা করার সময় অন্য মানুষ। এইসব রঙিন মাংসের পুতুল লাথি দিয়ে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। আলি কেনান নিজেকে নিজের ভেতর ধারণ করতে পারে না। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে অধিকতর অশ্লীল বাগ্ধারা প্রয়োগ করতে থাকে। অর্থী-প্রার্থীরা বিনা প্রতিবাদে তীক্ষ্ণ চোখা গালাগাল হজম করে। এমন কেউ থাকাও বিচিত্র নয় যে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে এসব ভক্তিভরে শুনলে অর্ধেক রোগ নিরাময় হয়ে যাবে। একবার একজন জোয়ান মানুষ আলি কেনানের কানেকানে স্ত্রীর বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ করে। আলি কেনান হুংকার দিয়ে বলে, শালা তর হাতিয়ারে জোর নাই। কবিলা তরে কেয়ার করব কেরে? হের

হাউস নাই? পুরুষের এশক ছ গুণ। মাইয়ামানুষের ন গুণ। এইরকম নানা কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ গরম দরবেশ হিসেবে আলি কেনানের নাম ফেটে যায়।

আলি কেনানের কাণ্ডজ্ঞানটি ভীষণ ধারালো। ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সে অনুভব করে, চারদিকে তার প্রভাব যে হারে ছড়িয়ে পড়ছে, সমস্ত কর্মকাণ্ড একটা শক্ত ব্যবস্থাপনার মধ্যে বাঁধতে না পারলে যে-কোনো মুহূর্তে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। পাছায় লাথি মারা, ডানহাত ডুবিয়ে পানিপড়া এসব করে অধিক দূর যাওয়া সম্ভব নয়। ভদ্র শিক্ষিত মার্জিত রুচির মানুষেরা তার কাছে আসতে আরম্ভ করেছে। তাদের চাহিদা, পছন্দ এবং রুচিমোতাবেক অনেক কিছু পালটাতে হবে। সে বেশ কিছুদিন মাথা খেলিয়ে একটা চমৎকার বুদ্ধি বের করল। নিজের ভাবনার চমৎকারিত্বে আলি কেনান নিজেই চমকে ওঠে

ফুলতলিতে একটা মসজিদ আছে। দু-তিনজন মানুষ মাত্র নিয়মিত নামাজ কালাম পড়ে। একমাত্র শুক্রবারেই মসজিদে অল্পস্বল্প লোকসমাগম হয়। ফুলতলি গরিব মহল্লা, তাই মসজিদটিও গরিব। নিয়মিত আজান প্রচারের জন্য একজোড়া মাইক লাগানোও সম্ভব হয়নি। প্রতিদিন মুয়াজ্জিন সাহেব পাখির ডাকের মতো চিহি স্বরে পাঁচবেলা আজানধ্বনি উচ্চারণ করেন। সে আওয়াজ মুয়াজ্জিন সাহেব নিজের কানে শুনতে পান কি না সন্দেহ আছে। মুয়াজ্জিন সাহেবে শুকনা পাতলা মানুষ। তাঁর গলার আওয়াজটিও অতিশয় ক্ষীণ। শুক্রবারে জুমার নামাজে ইমামতি করার দায়িত্বও তাঁর। সে হিসেব করল, তাকে মুয়াজ্জিন সাহেব না বলে ইমাম সাহেব বলাই সংগত। শুক্রবারে মহল্লার সর্দার সাহেব নিজে জুমার নামাজ আদায় করতে আসেন। কোনো কারণে সর্দার সাহেবের আসা বিলম্বিত হলে তার জন্য সমস্ত মুসুল্লিকে অপেক্ষা করতে হয়। সর্দার সাহেবের পূর্বপুরুষেরা এই মসজিদটি তৈরি করেছিলেন। সে কারণে সর্দার সাহেব নিজেই মসজিদের মোতওয়াল্লি। তাঁর অহংকারের অন্ত

নেই। কিন্তু ইমাম সাহেবকে মাইনেটা ঠিকমতো দিয়ে উঠতে পারেন না। মাঝে মাঝে পাঁচ-সাত মাস বাকি পড়ে থাকে। দেশের বাড়িতে ইমাম সাহেবের বিবি এবং বালবাচ্চারা আছে। তাদের দিন যে কেমন করে কাটে একমাত্র ইমাম সাহেবই বলতে পারেন। তিনি সব সময়ে আল্লাহর শোকর গুজার করেন। মাইনের কথা উঠালেই সর্দার সাহেব তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। এ নিয়ে তাঁকে কখনো উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি। এই মসজিদের চাকুরি ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কথা তাঁর মনে স্বপ্নেও উদয় হয়নি। অথচ ইমাম সাহেব সিকি মাওলানা কিংবা আধা মাওলানা নন। তিনি হাম্মাদিয়া ওহাবি মাদ্রাসা থেকে টাইটেল পাশ করেছেন। একেবারে পাক্কা সার্টিফিকেট আছে।

আলি কেনানের মাথায় খেলে গেল মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে একটা ব্যবস্থায় আসতে পারলে তার লাভ এবং ইমাম সাহেবেরও লাভ। আলি কেনান আরবি ফারসির বিন্দুবিসর্গ জানে না। তাবিজকবজ না দিলে আর চলছে না। তা ছাড়া শরিয়তের বিষয়ে সে একেবারে অজ্ঞ। এই পেশায় যখন চলে এসেছে, কখন কি ঘাপলা লাগে বলা তো যায় না। সুতরাং এরকম একজন মানুষ হাতের মুঠোর মধ্যে থাকা ভালো। বিপদে-আপদে কাজে আসতে পারে।

আলি কেনান তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারে, নিয়মিত খেতে না পেরে তার চেহারা এমন শুটকি হয়ে আছে। মাসকাবারি টাকা দিলে আরবিতে তাবিজকবজ লিখে দেবে এটা সে ধারণাই করে নিয়েছিল। তবু মনে একটা খটকা ছিল। এই জাতের মানুষ মিনমিনে হলেও অহংকারী হয়। তাই প্রস্তাবটা সরাসরি পাঠায়নি। তার বদলে এক সন্ধেয় মিলাদ পড়ার দাওয়াত করল।

ইমাম সাহেব প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন কি না মনে মনে দোটানায় ছিলেন। তিনি লোকমুখে শুনেছেন আলি কেনান অনেক শরিয়তবিরোধী কাজকারবার করে।

নিজের চোখেও দেখেছেন। ইমাম সাহেবে নিজে ওহাবি তরিকার মানুষ। কবর নিয়ে হইচই এসব মোটেও পছন্দ করেন না। তাঁর যদি ক্ষমতা থাকত এবং মহল্লার মানুষের সমর্থন পাওয়া যেত তা হলে কবে আলি কেনানকে ফুলতলিছাড়া করতেন। পাঁচ মাস কাজ করে এক মাসের মাইনে পান না যেখানে সেখানে ধর্মকাজ করার উৎসাহ আপনা থেকেই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তাই প্রতি শুক্রবার আলি কেনানের শরা, শরিয়তবিরোধী কাজকারবারের কথা তুলবেন তুলবেন মনে করেও তুলতে পারেননি। আর মনেও একটা শঙ্কা ছিল। আলি কেনান অল্পদিনের মধ্যে ফুলতলি এলাকার সামাজিক শক্তি হয়ে উঠেছে। তার ওখানে প্রতি বৃহস্পতিবার গানবাজনা হয়। ওতে মহল্লার অনেক তরুণ যোগ দিতে আরম্ভ করেছে। সর্দার সাহেবের বড় ছেলে এসব ব্যাপারে আলি কেনানের ডানহাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইমাম সাহেব লোকমুখে শুনেছেন স্বয়ং সর্দার সাহেব নাকি একবার গোটা রাত ওখানে গানবাজনা শুনেছেন। আলি কেনান মানুষটাকে ইমাম সাহেব মনে মনে ঘৃণা এবং ঈর্ষা করেন। ঘৃণা করেন এ কারণে যে তার মধ্যে একটা শয়তানি শক্তি আছে। এরই মধ্যে ফুলতলির অনেক তরুণ তার খপ্পরে পড়তে আরম্ভ করেছে। আলি কেনান তাদের শরিয়তবিরোধী কাজে উৎসাহ জোগায়। ইমাম সাহেব দশ বছর ধরে এই মহল্লায় বসবাস করছেন। নতুন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তিনি আজান দেন। মৃত্যু হলে জানাজা পড়ান। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে তিনি ফুলতলির নরনারীদের জীবনের শেষ তওবাও পাঠ করান। ভাগ্যের কী পরিহাস ইমাম সাহেবকে কেউ গেরাহ্যের মধ্যে আনে না। ছোট বাচ্চারাও তাঁকে নিয়ে যত তামাশা করে। অথচ এই আলি কেনান কদিন হল এসেছে, বড়জোর ছমাস। মহল্লার মানুষদের নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই ইমাম সাহেব আলি কেনানকে ঈর্ষা না করে পারেন না।

ইমাম সাহেব জ্ঞানত ঈর্ষা করতে চান না। কিন্তু আল্লাহ্ তো তাঁকে মাটির মানুষ করে পয়দা করেছেন। তবু ইমাম সাহেবের কোনো আফসোস নেই। খোদ রসুল

করিমই তো বলে গিয়েছেন, আখেরি জামানায় ফেতনা এবং গোমরাহির শক্তি সত্তর গুণ বেড়ে যাবে। এসবই ছিল আলি কেনানের মিলাদের দাওয়াত গ্রহণ করাবার দ্বিধাদ্বন্দ্বের আসল কারণ। সরাসরি দাওয়াত কবুল না করতেও তার মন চাইছিল না।

আলি কেনান দাওয়াতের সঙ্গে নগদ পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। তখন পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আস্ত একটি গরু পাওয়া যেত। ঐ তুচ্ছ টাকাকটিই গোল বাধাল। ইমাম সাহেব গোটা মাসে আজান দিয়ে এবং শুক্রবারে ইমামতি করে মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা পান। কোনো কোনো সময় পঁয়ত্রিশ মাস অপেক্ষা করেও টাকাটা ঠিকমতো পাওয়া যায় না। ইমাম সাহেব চিন্তা করলেন, আমি এই পঞ্চাশটি টাকা ছাড়ি কেন? যদি ছেড়েও দিই তাহলে আমার কী লাভ? এখন লোকে পাঁচ-সাত টাকা পেলে মিলাদ পড়ে। হাতেহাতে পঞ্চাশ টাকা পাওয়া গেলে বায়তুল মোকাররমের ইমাম সাহেবও চলে আসতে পারেন। তিনি আরো ভাবলেন, আমি তো আল্লাহর নামে হেদায়েত করব। ওতে তো দোষের কিছু নেই। গোমরাহির পথে হেদায়েত করব। ওতে তো দোষের কিছু নেই। গোমরাহির পথে কেউ গেলে তাকে তো আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনাও নায়েবে রসুলদের একটা দায়িত্ব। অতএব ইমাম সাহেব দাওয়াত কবুল করলেন।

ইমাম সাহেব মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন, তিনি শরিয়তবিরোধী কাজকর্মের কঠোর নিন্দে করবেন। আলি কেনানের নাম নেবেন না। তবু আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে ছাড়বেন না, আলি কেনানই এলাকায় যুবকদের কুপথে যাওয়ার ইন্ধন জোগাচ্ছে। কিন্তু সেদিন এশার নামাজের পর মিলাদ পড়তে এসে কোনো কথাই তিনি মুখ থেকে বের করলেন না। আলি কেনানের প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে একটা চড়ুই পাখি বলে মনে হতে লাগল। তাই তিনি শরিয়ত খেলাপ, কবর আজাব

ওসবের ধার দিয়েও গেলেন না। কেবল কোরান তেলাওয়াত করলেন এবং দরুদ শরিফ পড়লেন। তারপর মোনাজাত করে ফেললেন।

নামাজ শেষ হয়ে গেলে আলি কেনান স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ফুলতলির সমবেত মানুষদের কাছে জানতে চাইল, এ্যই তরা ইমাম সাবরে চিনোস।

অনেকে মাথা ঝুলিয়ে বলল,

হ্যাঁ তারা ইমাম সাহেবকে চেনে বটে। তিনি মসজিদে পাঁচবেলা আজান দেন, শুক্রবার ইমামতি করেন এবং কেউ কখনো মারা গেলে জানাজার নামাজ পড়ান। এবার আলি কেনান ভীষণ রেগে গেল।

শালা তরা বলদ ছিলি আর সারাজীবন বলদই থাকবি। খাঁটি চেনার তাকতনি আল্লাহ্ তগো দিছে। বাবজান বু আলি কলন্দর আমারে খোয়াবে দ্যাহা দিয়া কইছেন, তুই ইমাম সাবরে ডাইক্যা মিলাদ পড়া। হের লাইগ্যা মিলাদ পড়াইলাম। আমার কারবার দেল কোরান লইয়া। পাতা কোরান ভাইজ্যা যারা খায়, হেগোরে আমি ধর্মের দারোগা-পুলিশ মনে করি। কিন্তু বাবাজান বু আলি কলন্দর আমারে কইছেন, ইমাম সাহেবের দিলে আল্লাহর খাঁটি নুর আছে।

আলি কেনানের কথা শুনে মহল্লার সমস্ত মানুষ ইমাম সাহেবের দিকে তাকায়। তাদের কেউ কেউ ইমাম সাহেবের চুপসে যাওয়া মুখমণ্ডলে অন্তরের জ্যোতির প্রতিফলন দেখতে পায়।

আলি কেনানের প্রতি ইমাম সাহেবের রাগ বিদ্বেষ তো রইলই না বরং তাকে আল্লাহর বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত উঁচু মর্যাদার একজন বুজর্গ ব্যক্তি বলে ধরে নিলেন। এতদিন তিনি অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে ধর্মের পথে চলে আসছেন।

ইমাম সাহেব জীবনে কখনো আল্লাহ্ ওপর তাওয়াক্কাল রাখতে ভুল করেননি। দুবেলা আহার জুটুকু বা না-জুটুক তিনি ফুলতলির মানুষদের হেদায়েত করে আসছেন। কিন্তু ফুলতলির মানুষ তাকে অবহেলা এবং অবজ্ঞার অধিক কিছু দিয়েছে তাঁর তো সেকথা মনে পড়ে না। আজ আলি কেনানের মুখে তাঁর যে একটা নতুন পরিচয় ফুলতলির মানুষদের কাছে প্রচারিত হল কুদরতি ইলাহির এটাও একটা দৃষ্টান্ত বটে। তিনি মনে করলেন, ওহাবি তরিকার মানুষ হওয়ায় মারফতকে এতকাল কোনো দাম দেননি। আলি কেনানকে তিনি মন্দলোক ভেবে আসছিলেন, এটাও তাঁর মনের একটা সংস্কারমাত্র। অন্তরে মারফতি এলেমের পবিত্র জ্যোতি না থাকলে আলি কেনান তাঁকে এমনভাবে চিনলেন কী করে! অতএব মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনেয় আলি কেনানের আস্তানায় তাবিজ লেখার কাজটি কবুল করতে তাঁর কোনো আপত্তি হল না। বরঞ্চ এটাকে আল্লাহতালার বিশেষ রহমত বলে ধরে নিলেন।

আলি কেনান চারদিক থেকে সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছে। ফুলতলির সর্দার সাহেব এখন তার আস্তানায় নিত্য যাতায়াত করেন। ইমাম সাহেব এক কোনায় বসে জলচৌকির ওপর কাগজ রেখে বাঁদিক থেকে গুটিগুটি হরফে সুরা আয়াত লিখে লাল সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে তাবিজ বানিয়ে রাখেন। আলি কেনান সেসব তাবিজ মক্কেলদের দিয়ে বলে, গলায় ঝুলিয়ে রাখবি। অবস্থাভেদে তামা কিংবা পেতলের খোল ব্যবহার করতে বলে। বিবাহিত পুরুষমানুষ হলে বিধান দেয়, বিবির সঙ্গে সহবাস করার সময় খুলে রাখবি। মেয়েমানুষদের বলে, হায়েজ নেফাজের সময় খুলে পানিতে ভিজিয়ে রাখবি। গোসল করে পাকপবিত্র না হয়ে পরবিনে। তা হলে ক্ষতি হবে।

আজকাল আলি কেনান দুচারটে আরবি শব্দ উচ্চারণ করতে শিখেছে। ইমাম সাহেবের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার পর কিছু-কিছু আরবি বুলি তার কণ্ঠে আপনাআপনি উঠে আসছে। একথা সে বিলক্ষণ বুঝতে পারে। সে বুঝতে পারে তার ভেতরে ইমাম সাহেবের প্রভাব ক্রিয়া করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার সাধ হয় গভর্নর সাহেবকে ডেকে বর্তমান অবস্থাটা দেখায়। সেটি তো আর সম্ভব নয়! কখনো কখনো ভোলার কথা মনে পড়ে। তখন তার প্রাণটা ছ্যাৎ করে ওঠে। কী জানি কেমন আছে তার বুড়ো বাপ বুড়ো মা। বাঘের মতো ছয় ছয়টি ভাই, তারা কোথায় কী অবস্থায় আছে? হয়তো তারা জেলখানায় ঘানি টানছে। কিন্তু কী করতে পারে আলি কেনান? নতুন করে জীবন নির্মাণ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে সে বাঁধা পড়ে গেছে। ছেড়ে দিয়ে কোথাও যাওয়া তার পক্ষে এখন সম্ভব হবে না। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে দেখা যাবে। আলি কেনানের একদল নতুন ভক্ত জুটেছে। তারা তার মতো লালশালুর লুঙ্গি এবং আজানুলম্বিত আলখাল্লা পরে। গলায় বড় বড় কাঠের মালা ঝোলায় এবং বগলের পাশ দিয়ে পেঁচিয়ে লোহার শিকল কোমর অবধি দোলায়। আলি কেনান এই ভক্তসম্প্রদায়কে তার কল্পনার সন্তান মনে করে। অবশ্য ভক্তদের অতীত নিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা চালু আছে। মোট সাতজনের মধ্যে দুজন জেল খাটা দাগি আসামি। একজন সমকামী। একজন সংসারে পোড়খাওয়া একেবারে হতাশ মানুষ। সর্বক্ষেত্রে মার খেয়ে আলি কেনানের আস্তানায় মুখ্যত দুবেলা অন্নসংস্থানের জন্যই পড়ে আছে। বাকি দুটি ফুলতলিরই অল্পবয়স্ক কিশোর। তাদের মা-বাবা আছে, আছে ঘরবাড়ি। সংসারের কোনো জটিলতা তাদের জীবন স্পর্শ করেনি। তারা আস্তানায় এসেছে লোক সচরাচর যা পায় না, পাওয়া যায় না তেমনি অলৌকিক কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায়।

এই সাতজনের দলটি নিয়ে আলি কেনান শুক্রবার দিন খুব সকালবেলা বেরিয়ে পড়ে। কুকুরছানাটিও তাদের সঙ্গে যায়। রাস্তা দিয়ে গান গেয়ে বাজনা

বাজিয়ে বিচিত্র পোশাক পরে মিছিল করে যাওয়ার সময় শহরের মানুষ তাদের দিকে অবাক বিশ্বয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা গান গায়:

তোমরা দেইখাছ কোথায়?

শুকনা ডালে জবা ফুলে

ভ্রমর মধু খায়।

পরানপদ্মের গহিন তলে

মধুর রসের ধারা

সেইখানেতেই শুরুরে ভাই

মারফতের পাড়া।...

ফুলতলি পেরিয়ে বাংলাবাজার রোড ধরে এ রাস্তা সে-রাস্তা অতিক্রম করে আস্ত মিছিলটি হাইকোর্টে এসে থামে। হাইকোর্টের মাজার জমজমাট থাকে। এই মাজারের আভিজাত্য আছে। এখানে অনেক লোক আসে গাড়িতে চড়ে। তারা দান খয়রাতও করে। সেজন্য অন্য মাজারের তুলানায় এখানে গরিবগোরবা ফকিরফোকরার ভিড় বেশি। মাজারে আলি কেনানেরা অনেকক্ষণ গানবাজনা করে। তাদের গান মানুষের হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করে। দলের দুজনের কণ্ঠ খুব মিষ্টি। আলি কেনান বেছে বেছে সেসব গানই নির্বাচন করে, যেগুলো মানুষের অনুভবশক্তিকে ধাক্কা দিতে পারে। লোকজন চারপাশে ভিড় করে। গানবাজনার পর বাবার মাজার সালাম করে। দুপুর গড়িয়ে গেলে আবার পথে নামে।

এভাবে হেঁটে তারা নিমবাগান অবধি আসে। নিমবাগানের মাজারটিতে ঢুকে বোঁচকাবুঁচকি খুলে কিছু খেয়ে নেয়। খাওয়াদাওয়ার পাট সারা হলে আমগাছটির

ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে এবং গাঁজা টানে। তখন আলি কেনানের মনে জগৎজীবনের নানা রহস্য ভিড় করতে থাকে।

এই জগৎ কী? এখানে এলাম কেন এবং যাব কোথায়? এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ও তার মনে ছায়া ফেলে। যাহোক বিশ্রামপর্ব শেষ হলে শেষ গন্তব্যস্থল মিরপুরের শাহ আলি বাবার মাজারের উদ্দেশে পা বাড়ায়।

শাহ আলি বাবার মাজারে আলি কেনানের অসীম প্রতিপত্তি। তার কারণ অন্য কিছু নয়, তার দলটির গান। আলি কেনানের দলটি বাস্তবিকই সুন্দর গায়। গানের তো নিজস্ব ক্ষমতা আছে। হিন্দুরা গানকে স্বয়ং ভগবান মনে করে। বাংলাদেশের এত পির ফকির বুজর্গের মাজার, ভক্তবৃন্দের গানের শক্তিতেই তার বেশির ভাগ টিকে আছে। গানের রস না থাকলে মাজারগুলো মরুভূমি হয়ে যেত। সেখানে মানুষ যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই দেখা দিত না।

প্রতি শুক্রবারে বাবার মাজারে গানবাজনার আসর বসে। আলি কেনানের দলের মধ্যে জেলফেরত একজন দাগি আসামি এবং ফুলতলির কিশোরদের একজন, তারা বেবাক পরিবেশ ভাপিয়ে তোলে কণ্ঠের উত্তাপে। জেলফেরত লোকটির নাম কালাম। তার গলাটি একটু ভারী। আর অন্যদিকে কিশোরটির কণ্ঠস্বর বাঁশির মতো। আলি কেনানের দল বেছে বেছে সেসকল গানই গায় যেগুলো মানুষকে কাঁদায়, ভাবায় এবং চিন্তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। আলি কেনান কানপাকা মানুষ। দূরদূরান্তে যেখানেই ভালো গান শুনতে পায় কথাগুলো যত্নসহকারে কপি করে নিয়ে আসে। আল্লাহ্ আলি কেনানকে অনেক দিয়েছে। তবু আল্লাহ্ বিরুদ্ধে তার একটি নালিশ আছে। আল্লাহ্ তাকে গানের গলাটি দেননি।

আলি কেনানের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। মাজারে ঘুরে ঘুরে নানা কিসিমের মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটতে থাকে। ওদের কেউ স্বভাব-ভিখিরি।

কেউ মস্তান, লুচ্চা, বদমায়েশ সব ধরনের মানুষই মাজারে থাকে। মাজারে অবস্থান করে এমন দু- তিনটা জাত-খানকির সঙ্গেও তার চেনাজানা হয়েছে। এখানে সংসারবিরাগী স্বর্গপাগল মানুষ সে দেখেছে। দেখেছে ধর্মপ্রাণ মানুষ। ধর্মকর্মের ধার ধারে না, মেয়েমানুষ নিয়ে অবৈধ ব্যবসা চালায় তেমন মানুষও মাজারে থাকে। কেউ আপত্তি করে না। অন্ধ লুলা বোবা খঞ্জ পাপীতাপী সকলকে মাজার সমান স্নেহে আদরে লালন করে। মাজারের ছায়া অনেক দূর প্রসারিত। এখানে সবাই আশ্রয় পায়।

পয়লা দেখলে মনে হতে পারে মাজারে যে সকল মানুষ দেখা যায় তারা জন্মের পর থেকে এখানে বসবাস করছে। কিছু মানুষ স্থায়ীভাবে মাজারে বসবাস করে একথা সত্যি । কিন্তু পাশাপাশি আরেক দল মানুষ আছে যারা ভাসমান। এক মাজার থেকে অন্য মাজারে ছুটে ছুটে বেড়ায়। যে মেয়েটি বটগাছের ছায়ায় রেহেলে একটি কোরান শরিফ খুলে বসে থাকত, দেখা গেল একদিন হঠাৎ সে উধাও। হয়তো চট্টগ্রাম বায়েজিদ বোস্তামি কিংবা আমানত শাহের মাজারে একইভাবে রেহেলে কোরান নিয়ে বসে রয়েছে চুপচাপ। চুপচাপ বসে আছে এ কারণে যে সে কোরান পড়তে জানে না। হয়তো এক মাস কি দুমাস পর আবার মিরপুরের মাজারে হাজির হবে। অনেক তরতাজা, কারণ গায়ে নতুন হাওয়া লেগেছে। কেউ যদি জিগগেস করে, কই গেছিলি ফাতেমা খাতুন। ফাতেমা খাতুন ফোকলা দাঁতে হেসে জবাব দেবে, মুই গিছিলাম বাজি মস্তান (বায়েজিদ বোস্তামি)। যে অন্ধটির চোটপাটে প্রতিদিন মিরপুর মাজারে শায়িত বাবার ঘুম ভেঙে যাবার দশা হয় এক সকালে দেখা গেল সেও নেই। কাউকে কিছু বলেও যায়নি। পনেরো দিন বাদে দেখা গেল সিলেটে শাহজালাল বাবার মাজারে মনের সুখে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।

মাজারে যারা থাকে, তাদের সকলের না হলেও অনেকেরই, আলাদা একটি ভূগোল থাকে। মিরপুরের মাজার থেকে মানুষ খুলনায় খানজাহান আলী মাজারে যায়, সেখান থেকেও মানুষ আসে রাজশাহীর শাহ মখদুমের মাজারে। আবার শাহ মখদুমের মাজার থেকে মানুষ আসে হয়তো চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার। কেন যে তারা মাজারে মাজারে ঘোরাফেরা করে তা নিজেরাও বলতে পারে না। এটা একটা নেশার মতো। যাকে একবার পেয়েছে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে দেবে না। এই নেশা যাদের মনে অপেক্ষাকৃত গাঢ় তারা দেশের সীমানা অতিক্রম করে চলে যায় দূরে আরো দূরে । দিনে- রাতে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে বলে,

আল্লাহ নিজামুদ্দিন আউলিয়া, বখতিয়ার কাকির মাজার জিয়ারত করার সুযোগ দেও। এমনও মানুষ আছে যারা একবেলা খেয়ে পয়সা জমায় হিন্দুস্থানের সুলতান খাজা মইনুদ্দিন চিশতির রওজা শরিফ জেয়ারত করার জন্য।

আলি কেনানের প্রখর কাণ্ডজ্ঞান তাকে মাজারের নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপনার দিকটির প্রতি অধিক মনোযোগী করে তুলেছে। এই জিনিসগুলো সে অতি সহজে বুঝতে পারে। মাজারের অনেক কিছু সে বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। এক একটি মাজার বছরে লক্ষ লক্ষ টাকার নিলাম হয়। হাট বাজার পাটের মতো। যে সর্বোচ্চ অর্থ প্রদান করতে পারে সে বছরের সমস্ত টাকাপয়সা আদায় করার দায়িত্ব পেয়ে যায়। এদিক দিয়ে দেখলে একেকটা মাজার অন্য দশটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের চাইতে আলাদা নয়। তফাত শুধু এটুকু যে অন্য ব্যবসায়ে মূলধন মারা যাওয়ার ঝুঁকি আছে, মাজার ব্যবসায়ে তা নেই। মাজারে মানুষ আসবেই। মানুষ আসবে কারণ সে দুর্বল অসহায় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

সারাদিন মাজারের দানবাক্সে যত টাকা পড়ে, সন্ধেবেলা সে টাকা নিলামকার মহাজনের বাড়িতে চলে যায়। যত লোক রক্ষণাবেক্ষণে থাকে সব মাইনে-করা

কর্মচারী। জিলিপি, রসগোল্লা, আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপজল যত মাজারে আসে সব পিছনের দরজা দিয়ে ঘুরে আবার দোকানে চলে যায়। একেক দিনের মধ্যে এক সের মিষ্টি যে কতবার কেনাবেচা হয় কেউ হিসেব রাখতে পারে না। কেবল বিক্রির অর্থটাই জমা হয় মহাজনের সিন্দুকে। প্রতিটি মাজার নিজের নিয়মকানুনে চলে। এখানে সরকারের আইন বিশেষ কাজ করে না। গাঁজা, চরস, সিদ্ধি এসব অবাধে কেনাবেচা হয়। পুলিশের খপ্পরে পড়ার কোনো আশঙ্কা নেই। সে কারণে তাদের নিলামকারকে চড়াহারে কমিশন দিতে হয়।

আলি কেনান দেখেছে মাজারে শায়িত মহাপুরুষদের বংশধরদের মধ্যে মাজারের দখল নেয়ার জন্য কী তীব্র প্রতিযোগিতা। এক শরিকের মুরিদ আরেক শরিকে বাগিয়ে নিতে কোনোরকমের বিবেকদংশন অনুভব করে না। খুন জখম হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। বছরের পর বছর চলতে থাকে। এই সমস্ত কাহিনী মানুষ জানে, তবু তারা মাজারে আসে। স্বর্গবাসী পুরুষের মুক্ত চেতনার সঙ্গে পৃথিবীর শকুনিদের লোভলালসা এক করে না দেখার আশ্চর্য ক্ষমতা মানুষের আছে। তাই তারা মাজারে আসে।

গভর্নর হাউজে থাকার সময় আলি কেনান খুব নিকট থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। এই লাইনে আসার পর থেকে তার মনে হতে থাকে যে এখানে এই মাজারে সেই দ্বন্দ্বটি কম নয়। তবে সূক্ষ্ম এবং ঘেরাটোপের আড়ালে ঢাকা থাকে।

শাহ আলি বাবার মাজারে আলি কেনান প্রতি শুক্রবার দলবল নিয়ে গানবাজনা করত। সংগীতের একটা নিজস্ব দাহিকাশক্তি আছে। যারা শুনে বাহবা দেয়, তাদের যেমন সংসারযন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখে, তেমনি যারা গায় বাজায় তাদেরও সব ভুলতে বাধ্য করে। আলি কেনান নিজেকে এই সম্মোহন থেকে মুক্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা

করত। কিন্তু সফল হতে পারেনি। তার জীবনের এটা একটা দুর্বলতার দিক। এমনও হয়েছে, কোনদিক দিয়ে রাত শেষ হয়ে গেছে, টেরও পায়নি।

বিরাট বটগাছটির বাঁধানো চত্বরে আলি কেনানের দলটি গান করত। সাধারণত এ জায়গায় কাউকে গান করতে দেয়া হয় না। আলি কেনানের দলটি খুব ভালো গায় বলে এই বিরল সুযোগ পেয়েছে। অজগর সাপের মতো বটগাছের শেকড়ে হেলান দিয়ে একটা বুড়ো মানুষ বসে থাকে। বয়স বোধকরি সত্তর পঁচাত্তর হবে। এখনো শক্তসমর্থ আছে। বগলে দুটো লাঠি ভর দিয়ে বুড়োকে চলাফেরা করতে হয়। ঝড় হোক, বিষ্টি হোক বারো মাস বুড়ো শেকড়ে হেলান দিয়ে বসে থাকে। কারো কাছে কিছু একটা সাধারণত দাবি করে না। লোকজন প্রবৃত্ত হয়ে অনেক সময় টাকা, আধুলি এনামেলের প্লেটে দিয়ে যায়। লোকটাকে দেখলেই মনে হবে বটগাছটির মতোই প্রাচীন এবং একাকী।

ধীরে ধীরে এই মানুষটির সঙ্গে আলি কেনানের পরিচয় জমে ওঠে। আলি কেনান ভীষণ অহংকারী এবং উদ্ধত প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু বুড়োর মুখোমুখি দাঁড়ালে বিচলিত বোধ না করে পারে না। তার উগ্র স্বভাবটি আপনাআপনি সংযত হয়ে আসে। দুজনের মধ্যে একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হতে অবশ্য দীর্ঘ সময় লেগেছে। একদিন বুড়ো আলি কেনানকে জিগগেস করে,

অ মিয়া তোমরা হগলে দিনরাইত এই শিকলের বোঝা কেমন কইরা বও আলি কেনান এটুকুও না-ভেবে জবাব দিল,

এইডা আমাগো চিন্ন। বুড়ো ফের জিগগেস করে,

কিয়ের চিন্ন?

আলি কেনান বলে, বু আলি কলন্দর তরিকার চিন্ন। বুড়োর মুখে রসিকতা ঝিলিক দিয়ে ওঠে

বুল আলি কন্দরের কথা থাউক, তরিকা কারে কয় হেইডা বোঝনি?

আলি কেনান সত্যি সত্যি লা জওয়াব হয়ে যায়। বুড়োর কাছেই প্রথম জানতে পারে তরিকার অর্থ হল পথ। ঢাকা শহরে যতগুলো রাস্তা, লেন, বাইলেন আছে ইসলাম ধর্মেও ততগুলো তরিকা আছে। সব নদী যেমন সাগরে গিয়ে মেশে, তেমনি সব তরিকা আমাদের দ্বীনের নবি মুহম্মদের মধ্যে বিসর্জন দিয়েছে। আমাদের দ্বীনের নবি মুহম্মদ তিন লাখ সত্তর বৎসরের পয়গম্বরের সর্দার। আর সমস্ত আউলিয়া কুলের সর্দার হলেন হজরত আবদুল কাদির জিলানি। হজরত আবদুল কাদির জিলানির দুই কাঁধের ওপর স্থাপিত আমাদের দ্বীনের নবির কদম মোবারক এবং তামাম আউলিয়া কুলের কাঁধের ওপর চরণ রেখেছেন হজরত আবদুল কাদির জিলানি। বেবাক হিন্দুস্থানে যত আউলিয়া বুজুর্গ আছেন, তাঁদের সর্দার হলেন হজরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতি। তিনি গরিবি গোবরার দোস্ত এবং হিন্দুস্থানের সম্রাট। এই যে শাহ আলি বাবার মাজার দেখতে আছ তিনিও খাজাবাবার সিলসিলার বুজুর্গ।

এসব কথা আলি কেনান রূপকথার গল্পের মতো শোনে। সব কথা তার বিশ্বাস হতে চায় না। তবু বুড়োর বলার ধরনের মধ্যে এমন একটা ভঙ্গি আছে, সেখানে সম্ভব অসম্ভব বাস্তব অবাস্তবের মধ্যবর্তী সীমারেখা হারিয়ে যায়। তার মনে একটুআধটু ভাবান্তর আসে। মাঝে মাঝে মন ফুঁড়ে একটা প্রশ্ন জাগ্রত হয়:

মানবজীবন-এর কি কোনো উদ্দেশ্য আছে? গরম বালুতে পানি পড়লে যেমন হারিয়ে যায়, তেমনি কোনোকিছুই তার মনে স্থায়ী হয় না। গতবাঁধা পথে জীবন চলতে থাকে। মানুষজন এলে তাবিজ দেয়। কুকুরছানাটি নিয়ে আদায়ে বের হয়। আজকাল টাকাপয়সার তাগাদায় তার বের না হলেও চলে। তথাপি সে নিয়ম ভঙ্গ

করে না। সম্প্রতি আলি কেনানের মধ্যে একটা পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। বাইরে তার প্রকাশটি খুব স্পষ্ট নয়।

ফুলতলি মসজিদের ইমাম এবং শাহ্ আলি বাবার মাজারের বুড়োর কাছে সে অনেক কিছু শিখেছে। মাঝে মাঝে চোখ বুজে চিন্তা করে। তখন তার মনে হয়, সে সোজা কিংবা বাঁকা যে-কোনো পথে যাক না কেন, সর্বক্ষণ একটা ইতিহাসের ধারাকেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলেও সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। একটা-না-একটা ধারা এসে টেনে নিয়ে যায়। সে দরবেশের অভিনয় করছে, কিন্তু তার মধ্য দিয়েও সমস্ত দরবেশের সাধনার ধারা পাহাড়ি নদীর মতো ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আছড়ে পড়ে তাকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে। দুনিয়াটা বড় আশ্চর্য জায়গা।

ইমাম সাহেবের কাছ থেকে সে শরিয়তের নানা বিষয়ের বিস্তর সংবাদ সংগ্রহ করেছে। আর বুড়ো স্থূল জগতের মধ্যে যে আরেকটা সূক্ষ্ম জগৎ আছে সে বিষয়ে তাকে কৌতূহলী করে তুলেছে। আলি কেনানের গ্রহণশীলতার তুলনা নেই। সে যা শুনতে চায়, তাই-ই তোনে। তার সবকিছুই নিগড়ে বাঁধা, তার বাইরে এক চুল যেতেও তার মন প্রস্তুত নয়। সে বুড়ো কিংবা ইমাম সাহেব কারো কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেনি সে যে ধর্মকর্ম এসব বিষয়ে অধিক জানে না, একথা জানান দিতে আত্মসম্মানে বাধে। হাজার হোক জানাশোনার সঙ্গে কর্তৃত্বের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তো আছে। তাই দৈনন্দিন আলাপেসালাপে যতটুকু জানতে পেরেছে, তা-ই নিয়ে সে সন্তুষ্ট। তার প্রয়োজন ছাড়া কোনো বিষয়ে সে বেশি শিখতে চায় না। বেশি শেখার বিপদ আছে। তা হলে তাকে হয়তো ইমাম সাহেবে কিংবা বুড়োর মতো হতে হবে। সে ধরনের জীবন সে গ্রহণ করতে পারে না। জীবনকে পাকা সুপারির মতো সবসময় একটা নিরেট বস্তু হিসাবে দেখে। সে চরের মানুষ। দাপটের সঙ্গে

বাঁচাই তার আবাল্যের স্বভাব। মারো অথবা মরে যাও' এই হল তার কাছে জীবনের সংজ্ঞা। এই বাঁচার কী আনন্দ, বুড়ো কিংবা ইমাম সাহেব তা জানেন না। আলি কেনান অনেক তত্ত্বকথা শুনেছে বটে, কিন্তু বাস্তব কাজে অবহেলা করেনি। ফুলতলির আবাসস্থলটিতে কিছু-কিছু সংস্কারকাজ সে করে ফেলেছে। হুজরাখানার সংলগ্ন ফাঁকা জায়গাটিতে আরো দুটি নতুন ঘর উঠিয়ে নিয়েছে। দুজন মেয়েমানুষ, মা ও মেয়ে তার আস্তানায় এসে জুটেছে। সে অবাক হয়ে ভাবে তার যা প্রয়োজন আল্লাহ্ নিজে তা পাঠিয়ে দেন। আল্লাহ্ যে রহমানুর রহিম বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। তাকে ঘিরে ফুলতলিতে যে কর্মচক্র সৃষ্টি হয়েছে, মাঝে মাঝে তার মধ্যে নিজেকে বন্দি বলে মনে করে। এত ছলাকলা এত কলাকৌশল এসবের কি কোনো প্রয়োজন আছে? একটাই তো জীবন! একভাবে-না-একভাবে কাটিয়ে দেয়া যায়। যত লালশালুর আলখাল্লা পরুক, দাড়িগোঁফ বড় করে রাখুক, আলি কেনান জোয়ান মানুষ। একটি মেয়েমানুষের অভাবও সে তীব্রভাবে অনুভব করে।

তার অভাবগুলোও যে তীব্র। একেবারে জমাটবাঁধা। কিছুতেই অন্য বস্তু দিয়ে পূরণ করা যায় না। ভোলা থেকে সেই পুরোনো বউটিকে ফিরিয়ে আনার কথাও তার মনে এসেছে। সেটা অসম্ভব মনে করে তাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছে। সাপের পুরোনো খোলসের মতো সেই জীবন সে ফেলে এসেছে। কাঁচা ঘরের কড়ি বরগা যেমন পাকা ঘরের কোনো কাজে আসে না, তেমনি ভোলার জীবনের কোনোকিছুই তার আর কাজে আসবে না।

একদিন হুজরাখানা থেকে বেরিয়ে আচমকা আলি কেনান চমকে ওঠে। তখনো লোকজন আসতে শুরু করেনি। আলি কেনান দেখে দুজন মেয়েমানুষ হোগলার ওপর বসে আছে। তাদের মধ্যে একজনের বয়স চল্লিশটল্লিশ হবে। মুখে কয়েকটি গুটিবসন্তের দাগ। শরীরের বাঁধুনি এখনো বেশ শক্ত। অন্য মেয়েটির বয়স

আঠারো থেকে বিশের মধ্যে। গায়ের রং উজ্জ্বল ফরসা না হলেও মোটামুটি সুন্দরী বলা চলে। গরিব ঘরের মেয়ে ঠিকমতো খেতে পরতে পারে না, তাই রং জ্বলে গিয়েছে। ঠিকমতো খেতে পরতে পারলে গায়ের রং যে আরো খোলতাই হবে তাতে সন্দেহ নেই। আলি কেনান তার স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ ভঙ্গিতেই জিগগেস করল,

এ্যাই তোরা কী চাস? তবু তার গলার স্বর বুঝি একটু কাপল। বয়স্কা মেয়েমানুষটি তার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে বলল, বাবা আমারে বাঁচান।

আলি কেনান এই মুহূর্তটিতে বাবা ডাকটি শুনতে চাইছিল না।

সে বলল,

মাগি তামাশা রাখ। কী অইছে হেইডা ক।

মেয়েমানুষটি কেঁদেকুটে অনেকক্ষণ কসরত করে যা বলল তার সারমর্ম এরকম: মেয়েকে নিয়ে সে বস্তিতে থাকে। সোয়ামি চটকলে চাকুরি করত। বছর দুই হল মারা গিয়েছে। তার পর থেকে মা-মেয়ে এই বস্তিতে ডেরা পেতে আছে। মা-মেয়ে দুজনই পরের বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটায়। এই পেটের মেয়েই এখন তার কাল হয়েছে। মেয়ের কারণে তাদের দিকে বস্তির খারাপ মানুষদের দৃষ্টি পড়েছে। গতরাতে আট-দশজন মানুষ তার মেয়েকে লুট করে নিয়ে যাওয়ার জন্য হানা দিয়েছিল। তারা তাকে জানে মেরে ফেলবে বলে ভয়ও দেখিয়েছে। বহু কষ্টে ঘরের পেছনের বেড়া ভেঙে চুপিচুপি আর একটা ঘরে গিয়ে রাত কাটিয়েছে। এখন বস্তির কেউ আর তাদের আশ্রয় দিতে রাজি নয়। বেহুদা পরের জন্য নিজের বিপদ ডেকে আনতে কে রাজি হবে! বাবা দয়া করে আশ্রয় না দিলে এই সংসারে তাদের আর যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই। আলি কেনান আবার চিৎকার দিল,

মাগি তর লাঙ ঢুকাইবার স্বভাব আছে? কওন যায় না মাগিগো লগে শয়তান ঘুইরা বেড়ায়।

জবাবে মেয়েমানুষটা বলল,

বাবা চইদ্দ বছর বয়সের সময় আমার বিয়া অইছে। আপন খসম ছাড়া অন্য কুনু বেডা মাইনসের চউকে চউকে চাইয়া কতা কই নাই। সে আবার আলি কেনানের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে বলতে থাকল,

বাবা আমি একা অইলে কুনু ভাবনা আছিল না। পেডের মাইয়াডি গলার কাঁড়া। হেরে থুইয়া মরবার চাইলেও পারি না। আপনে আমাগোরে উদ্ধার করেন বাবা। এবার আলি কেনানে মেজজ একটু নরম হয়।

সে জিগগেস করে,

রাঁধবার পারবি?

হ বাবা পারুম, মেয়েমানুষটি জবাব দেয়।

এই কুত্তার বাচ্চারে গোসল করাইয়া রং মাখাইবার পারবি?

হ বাবা হগলডি পারুম। কেবল আমার পোড়াকপাইলা মাইয়াডারে বাঁচান।

তুই হগলডি পারবি? আলি কেনান অনেকটা ফিসফিস করে জিগগেস করে। মেয়েমানুষটি ঘাড় কাত করে।

আলি কেনান রাজি হয়ে গেল। যা অই খালি ঘরটাতে থাক গিয়া। খবরদার লাভ লুঙ ঢুকাইলে শাউয়ার মধ্যে তাজা আঙরা হান্দাইয়া দিমু। সেদিন সন্ধে থেকে আলি কেনান নারীর হাতের রান্না খাওয়া আরম্ভ করল।

মেয়েমানুষ দুটি আস্তানায় আসার পর থেকে আলি কেনানের উড়ুউড়ু ভাবটি অনেক কমেছে। সে অনুভব করে মাটির সঙ্গে শেকড়ের যোগ যেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিজেকে অকারণে পূর্বের চাইতে অনেক ভারী বলে মনে হতে থাকে। মেয়েমানুষটি অকৃপণ অনুরাগে তার সেবাযত্ন করে। প্রতিদিন দুবার করে ভেতরের ঘর, বাইরের ঘর ঝাঁট দেয়। হুজরাখানা পয়পরিষ্কার রাখে। আলি কেনানের সারা গায়ে সাবান মেখে গোসল করায়। গোসলের পর গা মুছিয়ে দেয়। গা মোছা সারা হলে সারা গায়ে মাথায় সরষের তেল দিয়ে মালিশ করে। যতই দিন যাচ্ছে, মেয়েমানুষটি আলি কেনানের জীবনের বাইরের অংশে অধিকার প্রসারিত করছে এবং আলি কেনানও ক্রমশ মেয়েমানুষটির ব্যবস্থাপনার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। তার মেয়েটি ক্বচিৎ ঘরের বের হয়। বাটনা বাটে, তরকারি কোটে, রান্নাসহ ভিতরের সব কাজ করে। আলি কেনান তার হাতের রান্নার তারিফ করে। সে সকাল বিকেল খাওয়ার পর আলি কেনানের জন্য চমন বাহার দিয়ে পান বানিয়ে পাঠায়। আলি কেনানের কাছে সে-পান খুব মিঠে মনে হয়।

এখনো আলি কেনান ভক্তদের নিয়ে প্রতি শুক্রবার জুড়ি আর খঞ্জনি বাজিয়ে মাজার পরিক্রমায় বের হয়। কুকুরছানাটিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। হাইকোর্টের মাজার সালাম করে নিমবাগান মাজারে এসে খাওয়াদাওয়া সারে। সেদিন গাজায় দম দিয়ে আলি কেনানের মনে হল, তার জীবনে এত সুখ রাখবার কোনো জায়গা নেই। ভক্তদের নির্দেশ দিল,

এই কালাম, এই বশির গানে টান দে। ভাব আইবার লাগছে। তখন সবকিছুর দুঃখ ভুলে গিয়ে তারা গাইতে লাগল:

জলিলও জব্বার বাবা

জলিলও জব্বার

তোমার প্রেমেতে হল

দুনিয়া গুলজার।

পেয়ে তোমার প্রেমের মধু

কুল ছাড়িল কুলবধূ

অসাধু হইল সাধু

প্রেমেতে তোমার।

আলি কেনান জানত না যে সে একটা বড় ধরনের ভুল করে বসে আছে। তখনো শুক্রবারের জুম্মার নামাজ শেষ হয়নি। নামাজের সময় গানবাজনা, স্বভাবতই মুসুল্লিদের কেউ-কেউ ভীষণ খেপে উঠেছিল। মাজারের খাদেমও এইরকম একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। নিমবাগানের মাজারটির পেছনে কোনো জমকালো ইতিহাস নেই। কোন সাধুপুরুষের দেহাবশেষের ওপর এই মাজার জন্ম নিল, তাঁর নামটিও আশপাশের মানুষ ভালো করে বলতে পারে না। খাদেম অবশ্য ইদানীং একটা লম্বা-চওড়া সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছেন 'হজরত অমজাত আলি শাহ খোরাসানি (রাঃ)-এর মাজার'। এই খোরসানি বাবা সম্পর্কে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করলে খাদেম একটা দীর্ঘ বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিয়ে থাকেন। কাহিনীটি বারো আউলিয়ার চরিতকথা নামক পুস্তক থেকে সংগ্রহ করে স্থানবিশেষে সম্পাদনা করে খোরাসানি বাবার নামে চালিয়ে থাকেন। খাদেমের মতে হজরত খোরাসানি বাবা বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের পরপরই সুদূর খোরাসান থেকে আপন পিরের নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই বাংলা মুলুকে আসেন এবং এইখানে দেহরক্ষা করেছেন। বাবার দুয়েকটা কেরামতির কথাও অবস্থা বুঝে প্রকাশ করেন। কেউ বলে,

বাবাজান কুমিরের পিঠে সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। আবার কারো মতে একটা মানুষখেকো বাঘ পিঠে করে তাঁকে বয়ে এনেছিল।

এই নিমবাগানের মাজারের খাদেমের শত্রুর অভাব ছিল না। তাদের কেউ বলত, একটি মামুলি কবরের ওপর এই মাজার উঠেছে। আবার কেউ-কেউ খাদেমের বিগত জীবন নিয়ে নানা কথা উত্থাপন করত। সেসব খুব একটা ধর্তব্যের ব্যাপার নয়। খোরাসানি বাবা এখানে দেহরক্ষা করেছেন কি না সেটাও বড় কথা নয়। আসল ব্যাপার হল মানুষের মনে অচলা ভক্তি আছে, সেই ভক্তি কোথাও নিবেদন করতে হবে। মানুষের ভক্তি এবং খাদেমের অক্লান্ত প্রয়াসে এই সুন্দর মাজারটি এই নিমবাগানের মাটি ফুঁড়ে জন্মাতে পেরেছে। মানুষের জীবনে সমস্যা আছে, আছে দুঃখ ও শোক। তারা যাতে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারে সেজন্য মাজারের পেছনে একটা জমাট ইতিহাসও চাই। এই খাদেমের কৃতিত্ব হল সেই ইতিহাসটি লোকগ্রাহ্য করে তুলতে পেরেছেন।

খাদেমকে কেউ নিয়োগ করেনি। তিনি স্বয়ং নিযুক্ত হয়েছেন। মাজারের কোনো কমিটি নেই। তিনি একাই সব। সবে তো মাজারের জন্ম হল। এত তাড়াতাড়ি কমিটি আসবে কোত্থেকে? অবশ্য তাঁর নিযুক্তির দাবির পেছনে একটা স্বপ্ন-নির্দেশের কথা বলে থাকেন।

খাদেম এই আলি কেনান মানুষটিকে শুরু থেকে সন্দেহের চোখে দেখে এসেছেন। তাদের পোশাকআশাকের জেল্লা, সঙ্গীসাথি এবং সংঘবদ্ধতা খাদেমের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। তিনি মনে মনে চাইতেন আলি কেনান যেন এই মাজারে না আসে। তাঁর একটা আশঙ্কা ছিল কোনোদিন আলি কেনান যদি মাজার দখল করে বসে। যদি তাঁকে তাড়িয়ে দেয়, সে বড় দুঃখের ব্যাপার হবে। তিনি অকূলে পড়ে যাবেন। আবার মুখ ফুটে তিনি নাও করতে পারছিলেন না, অলি আল্লাহর ভক্ত

আসবে, সেখানে খাদেম বাধা দেওয়ার কে? তাই তিনি তক্কে তক্কে ছিলেন, যদি কোনোদিন সুযোগ পাওয়া যায়।

আজকে না চাইতেই সেই সুযোগটা হাতের কাছে এসে গেল। আলি কেনানের অপরাধ সে নামাজের সময় গান গেয়েছে। তাতে মুসুল্লিদের নামাজের ব্যাঘাত হয়েছে। দ্বিতীয়ত দলেবলে সে গাঁজা খেয়েছে। তৃতীয়ত সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ যেটা সে করেছে, ধর্মস্থানে কুকুর নিয়ে প্রবেশ করেছে। কুকুর আমাদের রসুলের জানের দুশমন। মুসুল্লিরা প্রচণ্ড রকম ক্ষিপ্ত হয়ে আলি কেনান এবং তার দলবলকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিল। আলি কেনানের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। আলি কেনান ক্ষিপ্ত মুসল্লিদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল কুকুর খুব খারাপ জানোয়ার। কিন্তু মাঝে মাঝে খুব ভালো কুকুরও পাওয়া যায়। যেমন অসহাবে কাফের সঙ্গে একটা কুকুর ছিল। ক্রুদ্ধ মুসুল্লিরা তার কথা কানেও তোলেনি। তারা কুকরটিকেও এমন মার দিয়েছে, পেছনের পা দুটো একেবারে জখম হয়ে গেছে।

আলি কেনানের সমস্ত রাগ কুকুরটার ওপর পড়ে। সে ধরে নিয়েছে কুকুরটার কারণে তার এত লাঞ্ছনা। তাই কুকুরটার পেটে একটা লাথি দিয়ে রিকশায় উঠে বসল। তাদের সকলকে মিরপুরের মাজারে যাওয়া বন্ধ রেখে ফুলতলিতে ফিরে আসতে হল।

আসার সময় নিমবাগানের খাদেমের দিকে তর্জনী প্রসারিত করে বলল, খানকির পুত মনে রাখিস, তরে একদিন দেইখ্যা লমু।

অতি সংকটেও আলি কেনান কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে না। সে তার ভক্তদের বলে: এই কালাম, এই হাফিজ এই কতা ফুলতলির মানুষের কইয়া লাভ নাই। মনে থাকবে? শিষ্যেরা মাথা ঝাঁকায়।

সেই রাতে মেয়েমানুষটি পরম যত্নে তার সেবাশুশ্রূষা করে। গরম পানিতে গামছা ভিজিয়ে সারা শরীরের রক্তের দাগ পরিষ্কার করে। শরীরের জখমি জায়গাগুলোতে ডাক্তারের দেয়া মলম লাগিয়ে দেয়। আলি কেনান ডান হাতটা নাড়াতে পারছিল না। মেয়েমানুষটি নিজের হাতে গ্রাস পাকিয়ে ভাত খাইয়ে দেয়।

ক্লান্তিতে আলি কেনানের চোখ বুজে আসছিল। মাঝরাতে কী একটা স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙে যায়। দেখে এখনো মেয়েমানুষটি তার বিছানার পাশে বসে আছে। চোখের দৃষ্টি তার দিকে স্থির। আধো আলো আধো অন্ধকারে মেয়েমানুষটিকে তার চোখে একটি অনুচ্চ ঝোপের মতো মনে হচ্ছিল। হঠাৎ করে তার বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষা দুলে উঠল। সে ফিসফিস করে জিগগেস করে,

এই তর নাম কী রে? মেয়েমানুষটিও ফিসফিস করে জবাব দেয়, আমার নাম ছমিরন। অতিকষ্টে জখমি হাতটা বাড়িয়ে ছমিরনকে তার দিকে আকর্ষণ করে। ছমিরন যেন সেজন্যই অপেক্ষা করছিল। সে আলি কেনানের শরীরের সঙ্গে কাদার মতো লেপটে থাকে। সেদিন থেকে ছমিরন এবং আলি কেনানের মধ্যে একটা গোপন শারীরিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হল।

8

সেই ঘটনার পরের দিন আলি কেনানের ঘুম ভাঙে বেশ দেরিতে। অনুভব করে সর্বশরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। নড়াচড়া করার শক্তি নেই। তবু সে অনুভব করে একটা প্রশান্তি তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। তার আপন অস্তিত্ব পাথরখণ্ডের মতো ভারী মনে হয়।

এইদিকে সকালের রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। নতুন সূর্যালোক জাগ্রত ধরিত্রীর রূপরস গন্ধ তাকে ক্রমাগত চঞ্চল এবং উতলা করে তুলেছে। আলি কেনান অনুভব করে এই পৃথিবী সুন্দর। সুন্দর তার প্রসন্ন সূর্যোদয়,

সুন্দর সূর্যাস্ত ঘাসপাতা, গাছপালা, পাখপাখালি সবকিছু সুন্দর। আল্লাহ্ মেয়েমানুষ সৃষ্টি করেছে বলেই তো এ দুনিয়া এত রূপরসে ভরা। মেয়েমানুষ না থাকলে পৃথিবী একটি বিরান মরুভূমিতে পরিণত হত। আলি কেনান শুয়ে শুয়ে অনুভব করে, এই আকাশ পৃথিবীর কোথায় রসের একটা গোপন উৎসধারা খুলে গেছে। এই ধারাস্রোতে সে যেন ভেসে যাচ্ছে। সর্ব অস্তিত্বে নিজেকে নবজাত শিশুর মতো পেলব এবং সুকুমার মনে করতে থাকে।

আলি কেনান চোখ বুজে আছে, তবু টের পায় ছমিরন হুজরাখানায় ঢুকেছে। মেয়েমানুষের শরীরের আলাদা একটা ঘ্রাণ আছে । সহসা ছমিরনকে দেখার একটা তীব্র গভীর তৃষ্ণা মনের মধ্যে অনুভব করে। গা ধুয়েছে ছমিরন। তার মাথায় আধভেজা চুলের বোঝা পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। দুয়েক ফোঁটা পানি ঘাড়ের কাছটিতে চকচক করছে। মুখে গুটিবসন্তের দাগগুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে। চোখে চোখ পড়তেই ছমিরন ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। বাহু দুটো অকারণে নাড়া দিল। আলি কেনানের মনে হল,

এই বাহু দুটোর ভাষা আছে। যেন তারা বলছে, তুমি বাঁধা পড়ে গিয়েছ গো। আর যাবে কোথায়?

আস্তানায় লোকজন আসতে শুরু করেছে। অগত্যা আলি কেনানকে শয্যাত্যাগ করে উঠতে হয়। সে প্রাতঃকৃত্য শেষ করল। ছমিরন এবারও গরম পানিতে গামছা ভিজিয়ে তার সারা গা মুছে দিল। দুজনের মধ্যে একটি কথাও বিনিময় হয়নি। আলি কেনান ছমিরনের দিকে তাকাতে পারছিল না। কোত্থেকে একটা লজ্জা এসে তাকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছিল। সে বেমালুম ভুলে গেল, গতকাল তার ওপর একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেছে।

আলি কেনান বাইরে এসে দেখে হোগলার চাটাইয়ের ওপর লোকজন বসে রয়েছে, আর ইমাম সাহেব একটি জলচৌকির ওপর কাগজ রেখে কোরানের আয়াত লিখছেন । আলি কেনান ভীষণ বিরক্ত হল। রোজ রোজ একই দৃশ্য ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখতে হয়। ইমাম সাহেবেকে ডেকে বলে,

ইমাম সাহবে হগলডিরে কইয়া দ্যান, কারো লগে আমি কতা কইবার পারুম না। ইমাম সাহেব মিনমিন করে বললেন, অনেকে অনেক দূর থেইক্যা আইছে। চইল্যা যাইতে বলা কি ঠিক অইব? কথা না বাড়িয়ে আলি কেনান বলে,

তা অইলে আপনে দেইখ্যাশুইনা তাবিজ আর পানিপড়া দিয়া দ্যান। তার কথা শুনে ইমাম সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লেন!

আমি দিলে লোকের উপকার অইব।

আলি কেনান বলল, আপনে নিজেরে এত আদনা ভাবেন কেরে। কলন্দর বাবা স্বপ্নে কইছে, আপনে দিলেও কাম অইব। খুশিতে ইমাম সাহেবের চোখ দুটো নেচে উঠল। আপনে হাঁছা কইতাছেন?

হ হাঁছা।

সে বাইরে এসে রোজকার মতো মনু মনু বলে কুকুরছানাটিকে ডাকল। পরিচিত চিৎকার করে, ঘন্টি বাজিয়ে কুকুর ছুটে এল না।

কী কারণ? তখনই আলি কেনানের নিমবাগান মাজারের ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। শরীরের ব্যথা বোধ করি নতুন করে তেতে উঠল। পাশের ঘরে দুএকজন শিষ্য অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আলি কেনান হঠাৎ করে ভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। স্থির করে ফেলল খানকির বাচ্চাটাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে।

আলি কেনান বাস্তববাদী মানুষ। সবকিছু গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা তার আছে। মাথাটাও ভীষণ পরিষ্কার। সবচেয়ে কম ঝুঁকি গ্রহণ করে প্রতিপক্ষের মারাত্মক ক্ষতি কীভাবে করা যায় সে শিক্ষা যৌবনে চরদখলের সময় সে পেয়েছে। শরীরের স্নায়ুর সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঐ বিষয়টি ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে। তখন বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ কাটায়। তার মাথায় একটা নতুন পরিকল্পনা বিজলির শিখার মতো ঝিলিক দিয়ে জেগে উঠল।

গায়ের জড়তা, ক্লান্তি যথাসম্ভব দূর করে সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। কিছু-কিছু সাপ নাকি আছে, খেপে গেলে লেজের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছোবল মারে। আলি কেনানেরও অনেকটা সেই অবস্থা। সে শিষ্যদের হাঁক দিল:

এই কালাম, এই বশির, এই ফজলা তোরা হগলে আইয়া হুইন্যা যা। যে দুজন বাড়িতে থাকে, তাদেরকেও ডেকে আনা হল। ফজলা খুব কঁকাচ্ছিল। আলি কেনান তার পরিকল্পনাটা প্রকাশ করতে পারছিল না। তার একান্ত ইচ্ছে শিষ্যেরা মনপ্রাণ দিয়ে তার কথাগুলো শুনুক। সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য বাঘের মতো একটা হালুম করল। সকলে তার দিকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকায়। আলি কেনান বয়ান করতে আরম্ভ করে:

তোরা বেবাকড়িতে হুন, গত রাইতে কলন্দর বাবার কাছে অনেকক্ষণ ধইরা জারজার অইয়া কানলাম। কানতে কানতে ঘুমাইয়া পড়ছি কহন টেরও পাই নাই। একসময়ে দেহি হুজরখানা রোশনাইয়ে ভইরা গেছে। আর চাইরদিকে বেহেশতের বাস। আমি চউক মেইল্যা চাইয়া দেহি একডা বুইড়া মানুষ। মুহে শাদা দাড়ি। হাতে লাঠি আর গায়ে আমাগো মতোন শিকল। মুহের দাড়ি থেইক্যা, হাতের লাঠি থেইক্যা

রোশনি বাইর অইবার লাগছে। এমুন ছবি আমি আর জিন্দেগিতে দেহি নাই। বুইড়া মানুষডা আমারে কইল,

আলি কেনান তুই উইঠ্যা খাড়া। আমি কইলাম,

নিমবাগান মাজার আমারে ধইরা কিলাইছে। উঠবার শক্তি নাই । তহন তিনি আমার গায়ে হাতের লাঠি তুইল্যা একটা বাড়ি দিলেন। লগে লগে আমার দরদ ব্যথা সব চইল্যা গেল । আমি বুইড়া মানুষড়ার পায়ের উপর আছড়াইয়া পইরা কইলাম,

বাজান আপনে কেডা? তখন তিনি আমারে সোহাগ কইরা হাত বুলাইয়া কইলেন, আমার নাম বু আলি কলন্দর। আলি কেনান বলতে থাকে, শিষ্যেরা অবাক হয়ে শোনে। তারপর আমার দুই চউক দিয়া হুহু কইর‍্যা পানি পড়তে লাগল। বাবাজান তাঁর পাক হাতে আমার চউকের পানি মোছাইয়া কইলেন,

ব্যাটা আলি কেনান, তর দিলে খুব মহব্বত। আর কান্দনে কাম নই।

আমি কষ্ট পাইতাছি তোগো লাইগ্যা ।

আলি কেনান নির্বিকার বলে যাচ্ছিল। শিষ্যেরা সম্মোহিত হয়ে শুনছিল। দেখা গেল ইমাম সাহেবও আয়াত লেখা বন্ধ করে মুগ্ধ বিস্ময়ে আলি কেনানের স্বপ্নপুরাণের কথা শুনছেন। আলি কেনান বলে যায়,

তারপর বাবা আমারে কইলেন, খোরাসানি আমার মুরিদ আছিল। এই ব্যাপারে তার লগে আমার ফাইনাল কতা অইয়া গেছে।

ওই খাদেম ব্যাটা নাপাক বজ্জাত আর হারামি। তুই অরে খেদাইয়া মাজারের দহল লইয়া ল। তিনখান কতা মনে রাখিস। কুত্তা লইয়া যাবি না। অহন আসহাবে কাফের জমানা নয়। অহন কুত্তা নাপাক। জন্তু জানোয়ারে যদি হাউস থাহে, ভেড়া লইয়া যাবি ভেড়া পাক জন্তু। আমাগো দ্বীনের নবি ভেড়ার গোশত খাইতে পছন্দ

করতেন। আর হুন এশার নামাজের আগে গানবাজনা করবি না। আমার ঘুম ভাইঙ্গ্যা গেল। দেহি শরীরে আর দরদ ব্যথা নাই। বেবাক ঘরে ম ম খোশবু। আমি কানতে কানতে কইলাম,

বাজান আরেকবার দর্শন দ্যান। আমার চউকে আর নিদ্রা আইল না। তরা হুইঙ্গা দেখ অহনও আমার গতরে খোশবু লাইগ্যা আছে। ইমাম সাহেব নাকটা আলি কেনানের আলখাল্লার কাছে নিয়ে গেলেন,

হাঁছাই তো দেহি, চম্পা ফুলের মতো বাস পাওয়া যায়। বু আলি কলন্দর যে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন, সে ব্যাপারে আর কারো সন্দেহ রইল না।

এতকিছুর পরও আলি কেনানের মনের দ্বিধার ভাবটা কাটল না। জেলফেরত আসামি কালামের মুখে একটুও ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। শুরু থেকেই আলি কেনানের মনে বেজেছে এই কালাম হারামজাদা তার কথায় বিশ্বাস করে না। এমনকি মনে মনে তাকে একটা দাগাবাজ ভাবলেও সে বিস্মিত হবে না। মানুষের মনের ভাষা পাঠ করার ক্ষমতা না থাকলে সে এই অল্পদিনে এতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত না। কালাম এখানে থাকলে খেতে পায় বলেই আছে। তার মনে নিশ্চয়ই অন্য কোনো মতলব আছে। তথাপি আলি কেনান তাকে তাড়িয়ে দিতে পারেনি। তা হলে দলটি কানা হয়ে যায়। আরো একটি বিষয় চিন্তা করার আছে। কালামের গানের গলাটি ভারি মিষ্টি

আলি কেনান হুংকার দিয়ে বলল,

এই শালা কালাম্যা অত কী ভাবতে আছস? হুনলি বাবা বু আলি কলন্দর কী কইয়া গেছেন? অহন তোরা কী করবি হেইড্যা ক । কালাম কোনোরকম দ্বিধা না করেই বলল,

তা অইলে তো মারামারি করতে অয়। আর মারামারি কইর‍্যা আমরা পারুম কেমনে। অরা অনেক। একবার খাদেমের মাইনষে আমাগো খেদাইয়া দিছে। আপনে কী করবার চান আপনে জানেন, আমি কিছু কইবার পারুম না। তাকে কথা বাড়াতে না দিয়ে আলি কেনান বলে বসল,

হ হাঁছা কতাই কইছস। আমি বাবা বু আলি কন্দরের হাতের বাঁশি। তিনি যেভাবে বাজান, আমি সেভাবে বাজি। আর তরা আমার হাতের যন্ত্র। যা করবার কইমু, কেউ তখন আলি কেনানের প্রতিবাদ করল না সুতরাং সে নিশ্চিত হয়ে তার পরিকল্পনাটা প্রকাশ করে। আমরা হগলে যাইয়া আগামী শুক্রবারে মাজারের দখল লইয়া লমু। আমাগো উপর বাজানের দোয়া আছে। কুনু বাপের ব্যাটা ঠ্যাহাইতে পারত না। বাজান যা যা কইছেন আমরা হগলডি মাইন্যা চলুম। ঐ মাজারে আমরা তামুকটামুক খামু না। এশার নামাজের আগে গানবাজনা করুম না। আর ভেড়া লইয়া যামু। বাজান কইছেন, ভেড়া পাক জন্তু। তরা জখমটখম সারাইয়া ল।

কালাম বলেই বসল,

অরা অনেক, আমরা মাত্র সাতজন।

আলি কেনান ধমক দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিল।

শালা চোর, তর দিলে ইমানের তেজ নাই। বাবা মঈনুদ্দিন একলা আইসা তামাম হিন্দুস্থানে ইসলাম জারি করছে। ইমানের বলে অসাধ্য সাধন করা যায়। তার পরে আর কারো কিছু বলার থাকে না।

ফজল আর মুন্নাফ গাবতলির হাটে গিয়ে দুধের মতো শাদা দবধবে একজোড়া ভেড়ার বাচ্চা কিনে আনে। আলি কেনান নিজে দাঁড়িয়ে তাদের গোসল করানো দেখল। তারপর রোদে বেঁধে রেখে গা শুকিয়ে নেয়া হল। লোমগুলো একেবারে

ঝরঝরে হয়ে গেলে দুটি গামলাতে রং গুলে একটাকে সামনের দিকে সবুজ এবং পেছনে লাল রং লাগানো হল। আর অন্যটাকে পেছনের দিকে নীল এবং সামনের দিকে হলুদ রং মাখিয়ে দেয়া হল। গলায় চামড়ার বেল্ট পরিয়ে ঘন্টি লাগানো হল। চার-পাঁচদিন ধরে শিষ্যরা শিকল ধরে শহরের রাস্তায় ভেড়ার বাচ্চাদের হাঁটাচলার ট্রেনিং দিল।

শুক্রবার দিন ঠিক জুমার নামাজের পূর্বমুহূর্তটিতে আলি কেনানেরা সদলবলে নিমবাগের খোরাসানি বাবার মাজারে এসে হাজির হল। কোনোরকম বিলম্ব না করেই সকলে নামাজের কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। কেউ-কেউ কৌতূহলী হয়ে তাদের দিকে তাকায়। দুয়েকজনের অনুতাপও হয়। তারা গত শুক্রবারে এই ফকিরদের গায়েই হামলা করেছে। কার দিলের ভেতর কী আছে সে তো আল্লাহ্ জানেন। পারতপক্ষে কেউ বিবেকের কাছে দায়ী হতে চায় না। সুতরাং নামাজশেষে যে যার মতো ঘরে চলে গেল।

আলি কেনানেরা মসজিদে প্রবেশ করার সময় ভেড়ার বাচ্চা দুটোকে মাজারের সামনে শ্বেতকরবী গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে গিয়েছিল। গত শুক্রবারেও তারা কুকুরটিকে এই নিমবাগানের মাজারেই রেখে গিয়েছিল। বেচারি আহত কুকুর সেই থেকে এখানেই পড়ে আছে। কুকুরসুলভ ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বোধ করি বুঝতে পেরেছিল, আলি কেনানের অন্ন আর তার ভাগ্যে নাই। ভেড়ার বাচ্চা দুটো দেখে কুকুরের প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হওয়া একটুও অস্বাভাবিক নয়। তাই হাঁ করে ভেড়ার বাচ্চা দুটোকে কামড়াতে ছুটে আসে। রং-করা ভেড়ার বাচ্চা দুটো প্রচণ্ড ভয় পেয়ে চিৎকার করতে থাকে। ভাগ্যিস তখন নামাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। নইলে আজকেও একটা অঘটন ঘটে যেতে পারত।

খাদেম মাজারেই ছিলেন। আসলে তিনি আলি কেনানের কাজকর্মের ওপর নজর রাখছিলেন। তিনি অসম্ভব রকম খেপে গিয়ে আলি কেনানকে বললেন,

অ মিয়া তোমার মনে কী আছে কও তো দেহি? একবার আস কুত্তা লইয়া, একবার আস ভেড়া লইয়া। মাইর খাইয়াও তোমার শিক্ষা অইল না? মাজারটারে নাপাক না কইরা ছাড়বা না দেখছি। তোমার মতিগতি তো সুবিধার নয়।

আলি কেনান এটাই চেয়েছিল। সে খাদেমকে বলে,

তর কথা শেষ অইছে?

খাদেম বললেন,

এইখান থেইক্যা কাইট্যা পড়ো। আর কুনুদিনই এইমুখি আইবা না। আইলে পিডের ছাল থাকত না। আলি কেনান তার আপন স্বরূপ প্রকাশ করল।

খানকির পোলা, তর বড় বাড় অইছে। আর বাড়তে দিমু না। বাবা বু আলি কলন্দর আমারে খোয়াবে আইস্যা কইয়া গেছেন খোরাসানি বাবা বু আলি কলন্দরের মুরিদ আছিল। বাবায় কইছেন, তুই মাজার নাপাক কইর‍্যা ফেলবার লাগছস। তরে মাজার থেইক্যা তাড়াইয়া দিবার হুকুম দিছেন। কুত্তা আছিল নাপাক জন্তু, হের লাইগ্যা কুত্তারে তর কাছে রাইখ্যা গেছি। তুইও নাপাক, কুত্তাও নাপাক। এইবার ভেড়া লইয়া আইছি। ভেড়া পাক জন্তু । আমাগো দ্বীনের নবি ভেড়ার গোশত খাইতেন।

খাদেমের মনে তখনো যথেষ্ট সাহস ছিল। গত জুমার দিন তিনি নিজের চোখেই তো দেখেছেন আলি কেনানরা কেমন মারটা খেয়েছে। আশা করেছিলেন আজকেও তেমন একটা কিছু ঘটে যাবে। আর শরীরের উত্তেজনাও এসে গিয়েছিল। তিনি বলেই বসলেন,

বেশি তেড়িবেড়ি করলে জান খাইয়া লমু মিয়া, কাইট্যা পড়ো। শুয়োরের বাচ্চা, খানকির পোলা, গত শুক্কুরবারে কী করছস মনে আছে? অহনও গতরের দরদ ব্যথা যায় নাই। এককক্ষণে এ্যাই মাজার থাইক্যা দি বাইর অইয়া না যাস, খুন কইরা পুঁইত্যা রাখুম। সাত সাতজন মানুষ খাদেম সাহেবের দিকে তেড়ে এল। খাদেম ডানে-বামে সামনে-পিছনে তাকিয়ে দেখেন, তিনি একেবারে একা। সাহায্য করার মতো কেউ নেই। তবু কণ্ঠের শেষ জোরটুকু প্রয়োগ করে বললেন,

অ মিয়া আগেভাগে কইয়া রাখলাম, ভালা অইব না কিন্তু।

শাউরের পুত। তরে ভাল অহন দেখাইতাছি।

আলি কেনান খাদেমের কপালে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। শিষ্যেরাও ছুটে আসে। খাদেম সাহেব কমজোর মানুষ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে ধরাশায়ী করে ফেলতে তাদের কোনো অসুবিধে হল না।

নিমবাগানের কিছু-কিছু কৌতূহলী মানুষ চারপাশে জড়ো হয়ে মজা দেখে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ জিগগেস করে, কী হয়েছে, অমন করে মানুষটিকে মারছ কেন?

আলি কেনান তার কণ্ঠস্বর এক কাঠি চড়িয়ে বলে,

না মাইর্‌্যা পেয়ার করুম নাকি? আপনেরা এই হারামিরে চেনেন? হারামজাদা খুনি বজ্জাত। ব্যাটা ডাকাইত, মাজারটারে পচাইয়া ফেলাইল। জানেন অর নামে থানায় দশটা মামলা আছে? তার শিষ্যদের নির্দেশ দিল,

এই নাপাক জন্তুটারে, ব্যাবাকডিতে বাইরে থুইয়া আয়। শাউরের পুত মনে থাকে য্যান, মাজারে আবার যদি দেখি জান খাইয়া ফেলামু।

যথেষ্ট মানুষ জমা হয়েছিল। ইচ্ছে করলে খাদেম আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতেন। আলি কেনানরা তাঁকে মেরেছে, খুনি বলেছে, ডাকাত বলেছে, বলেছে থানায় মামলা আছে। তিনি কেন চুপ করে থাকলেন, তিনিই বলতে পারেন। তাঁকে নিরুত্তর দেখে লোকজনও এগিয়ে এল না। কেউ-কেউ মনে করল, হয়তো লোকটার অতীত খুবই খারাপ। গর্হিত কোনো কাজ করে মাজারে ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছে।

খাদেমকে তাড়ানোর পর আলি কেনানের দলবল মাজারে প্রবেশ করে আল্লাহ্ আল্লাহ্ শব্দে জিকির করতে থাকে। নিমবাগানের কিছু-কিছু মানুষ মনে করল, তাদের মহল্লার মাজারটির নিশ্চয়ই কিছু আছে। নইলে পাগল দরবেশের দল কি আর শুধোশুধি জিকির করতে আসে। আলি কেনানেরা চিৎকার করে জিকির করতে করতে মুখে ফেনা তোলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর লাইলাহাইল্লাল্লাহ শব্দে দ্বিতীয় দফা জিকির আরম্ভ করে। জিকির শেষ করে আলি কেনান শিষ্যদের সামনে সিনা টান করে দাঁড়িয়ে বলল,

তগোরে কইছিলাম না, বাবায় কখনো মিছা খোয়াব দেহায় না। অহন ত তরা চউকের সামনে পরমান পাইয়া গেলি। এই জানোয়াররে আমরা বাইর কইরা দিছি। অহন মাজার আমাগো।

আলি কেনানের অট্টহাসি আসতে চায়। আল্লাহ্ যা করে ভালার লাইগ্যা করে। হেইদিন হেই কাণ্ড না ঘটলে, আইজকার ঘটনা ঘটত না। মাজার আলি কেনানদের দখলে চলে এল।

আলি কেনান চরের মানুষ। কোনো জিনিস দখল করলে কী করে রক্ষা করতে হয় তা সে ভালোভাবেই জানে। সে শিষ্যদের মধ্যে তিনজনকে সার্বক্ষণিকভাবে নিমবাগানের মাজারে মোতায়েন রাখল। সেও প্রায় প্রতিদিন বেলা দশটার সময়

রিকশায় চেপে ফুলতলি থেকে এখানে এসে হাজির হয়। প্রথম চার-পাঁচদিন তারা আশেপাশের লোকজনকে জানিয়ে দিল:

আগে যে-মানুষটি এই মাজারে থাকত সে একটা খুনি ডাকাত। থানায় তার নামে দশ-বারোটা খুনের মামলা আছে। জনমত তো সব সময় হাওয়ার অনুকূলে চলে। তারা ধরে নিল ব্যাপারটা সত্য হতেও পারে। কেউ কেউ অবাক হয়ে চিন্তা করল, এতদিন এই খাদেম লোকটা তাদের বোকা বানিয়ে গেছে। আল্লাহর দুনিয়াতে কতরকমের যে ভেলকিবাজ আছে।

আলি কেনান বসে থাকার মানুষ নয়। ইতিমধ্যে সে নিমবাগানের ওয়ার্ড কমিশনারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে ফেলেছে। এলাকার আরো কিছু প্রভাবশালী মানুষের সঙ্গে তার জানপহেচান হয়ে গেছে। কিছু বখাটে এবং বেকার যুবক কিশোরও তার সঙ্গে জুটে গেল। আলি কেনান ছোকরাদের কানে মন্ত্র দিয়েছে আগামী পাঁচই রজব মাঘ মাসের তেইশ তারিখে খোরাসানি বাবার মাজারে ওরস করতে হবে। ছোকরারা গিয়ে কমিশনারকে ধরেছে। আমরা মাঘ মাসের তেইশ তারিখে খোরাসানি বাবার মাজারে ওরস পালন করব। আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে।

কমিশনার সাহেবের ছোকরাদের সঙ্গে থাকতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু তিনি ভয় পাচ্ছিলেন ছোকরারা তাঁর কাছে একটা গরু কিংবা খাসির দাম দাবি করে বসবে। এই আশঙ্কায় তিনি উসখুস করছিলেন। তিনি আপত্তি করে বললেন,

হঠাৎ করে ওরস কী ব্যাপার? ছোকরাদের একজন বলে বসল,

কোনোদিন ওরস হয়নি বলে এবার ওরস হবে না, তার কোনো অর্থ থাকতে পারে না। আপনি এটা কী কথা কইলেন, আপনি কোনোদিন তো কমিশনার হননি।

এইবার হয়েছেন। সত্য কি না কন। বলে রাখলাম, আমরা এবার ওরস করব, আপনাকে পেছনে থাকতে হবে।

কমিশনার বুঝে গেলেন, তিনি রাজি না হলেও ওরা ওরস করে ফেলবে। তাই কথা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, না না, আমি সেকথা বলিনি। তবে এখন টাকাপয়সার খুব টানাটানি চলছে কিনা,

তোমরা যদি টাকাপয়সা দাবি করে বস আমার দেবার ক্ষমতা নেই। ছোকরারা বলল, আপনাকে টাকাপয়সা দিতে হবে না। আপনি শুধু পেছনে থাকবেন। আমরা রাস্তায় গাড়ি আটকে টাকা উঠাব। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল তুলব। বাজারের মহাজনদের কাছে যাব। এরকম একটি সুন্দর প্রস্তাবে কমিশনারের আপত্তি থাকার কোনো কারণ রইল না। আলি কেনানের শিষ্য এবং নিমবাগানের ছোকরারা বাহুতে মাথায় লালশালুর ফেটি বেঁধে রাস্তায় নেমে পড়ল। প্রতিটি বাস, প্রাইভেট কার থামিয়ে দাবি করতে থাকল।

খোরাসদানি বাবার ওরস, চাঁদা দিন। কত টাকা কত জায়গায় খরচ করেন, দিন আল্লাহর নামে দশ বিশ টাকা দিয়ে যান। গাড়িওয়ালাদের মধ্যেও ঘাউরা লোক কম ছিল না। তারা অনুরোধ কানে তুলল না। অনেকে দশ পনেরো টাকার বদলে গাড়িটা অক্ষত ফেরত নিয়ে যেতে পারছে ভেবে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। আরেক দল বস্তা কাঁধে নিমবাগানের বাড়িতে বাড়িতে ধরনা দিতে থাকল। আগামী তেইশে মাঘ খোরাসানি বাবার মাজারে ওরস। সুতরাং চাল দেন, টাকা দেন, যে যা পারেন দেন। একেবারে না করবেন না। আল্লাহ্ বেজার হবে। টাকাপয়সা চাল এসব মন্দ উঠল না। কিন্তু তার একাংশ দেশী মদ এবং ব্লুফিল্ম-এর পেছনে হাওয়া হয়ে গেল। তার পরেও দু-দুটো গরু তারা কিনতে পারল। বাজারের মহাজনদের কাছে গিয়ে তেল মশলা,

ডাল এবং অন্যান্য জিনিসপত্তর খুব অনায়াসে জোগাড় করে ফেলল। ব্যবসায়ীরা তো ধর্মকাজে টাকাপয়সা দিতে কৃপণতা করে না।

দেখতে দেখতে আঠারোই মাঘ এসে গেল। সেদিন সকাল থেকে কাজের অন্ত নেই। নতুন লালশালু দিয়ে মাজার সাজানো হচ্ছে, শামিয়ানা টানানো হচ্ছে। প্রাঙ্গণের ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করা হচ্ছে। এত কাজ করার মানুষ কোত্থেকে এল কেউ বলতে পারে না। কোরান খতম হচ্ছে, দরুদপাঠের শব্দ ভেসে আসছে। জোহরের নামাজের পর গরু দুটো জবাই করা হল। ভিখিরি এবং নগর কাকের চিৎকারে কান পাতা দায় হয়ে পড়ল। আছরের নামাজের অন্তে খোশবাগ শাহি মসজিদ এবং বায়তুল তুমাম মসজিদের ইমাম সাহেবে দুজন এসে মিলাদ পড়ালেন। তাঁরা আল্লাহর মহিমা, নবির তারিফ বয়ান করার পর কবরে শায়িত মহাপুরুষের রুহের শান্তি কামনা করে মোনাজাত করলেন। মহাপুরুষের দয়ার অছিলায় দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান নরনারীর গুনাহ্ মাফের আরজ করলেন।

নিমবাগানের চিন্তাশীল মানুষেরা ভেবে দেখলেন এই মাজারটির নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক মহিমা আছে। নইলে জামানার বুজুর্গ এই সমস্ত বিশিষ্ট আলেম এখানে ফাতেহা পাঠ করতে আসবেন কেন? অনেকের মন থেকে সন্দেহের শেষ বাসনাটুকুও দূর হয়ে গেল। মাগরিবের নামাজের পর খাওয়াদাওয়া শুরু। মাত্র দুটো গরু জবাই হয়েছে। অন্যান্য বড় বড় ওরসের তুলনায় এটা কোনো ব্যাপারই নয়। দীন আয়োজনই বলতে হবে। তবে বড় কাজের সূচনা দীনভাবে হওয়াই ভালো। এ বছর দুটো গরু জবাই হয়েছে। তার পরের বছর বিশটা। এমনিভাবে বাড়তেই থাকবে। ওরশ যত জমকালো হবে, বাবার মহিমাও গত ছড়িয়ে পড়বে।

এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি সবাই এসেছিলেন। ভিখিরি যারা এসেছিল ভরপেট খেতে পেরেছে। তার পরেও বেশকিছু ভাত এবং মাংস ডেকচির তলায় ছিল।

সেগুলো মাটির সানকিতে করে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়িতে বিলিবন্টন করা হল। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে এশার নামাজের পর শুরু হল গান। আলি কেনানের দলটি তো ছিলই। তা ছাড়াও বাইরের একটি কাওয়ালির দল আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। রাতভর গানবাজনা চলল। ছোট একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া তেমন খারাপ কিছু ঘটেনি। সেটা হল: নিমতলির দুদল ছোকরার মধ্যে চাঁদার টাকার ভাগাভাগি নিয়ে প্রথমে তর্কাতর্কি তারপর হাতাহাতি। বয়স্করা এগিয়ে এসে মিটমাট করে না দিলে খুনোখুনি পর্যন্ত গড়াতে পারত। নিমবাগান এলাকায় আলি কেনানের খুব সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। বলতে গেলে আলি কেনানের চেষ্টার পরই খোরাসানি বাবার নাম প্রচার হয়েছে। পুরোনো খাদেমটির কথা ভুলে যেতেও মানুষের সময়ের প্রয়োজন হল না।

৫

নিমবাগানের মানুষেরা আলি কেনানকে ফুলতলির বাস উঠিয়ে দিয়ে নিমবাগানে উঠে আসতে যথেষ্ট অনুরোধ করেছে। এখন নিমবাগানের মানুষ তাকে তাদের গৌরব বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। একথা আলি কেনানের মনেও একাধিকবার জেগেছে। কিন্তু ফুলতলির বাঁধানো কবরটি ছেড়ে দিতে তার মন চায় না। এই কবরটি দিয়েই তার এতদূর প্রতিষ্ঠা। নাড়ির বন্ধনের মতো ফুলতলির প্রতি একটা টান অনুভব সে না করে পারে না। তা ছাড়া সে ভয়ানক হুঁশিয়ার। সবদিক নিশ্চিত না হয়ে কোনো কাজ করে না। এখনো পর্যন্ত আলি কেনান ফুলতলি আর নিমবাগানে পালা করে যাওয়া-আসা করেই কাটাচ্ছে। ফুলতলিতে মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থাকলেও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ইমাম সাহেব একা চালিয়ে নিতে পারবেন। ইমাম সাহেবের বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনি আলি কেনানের দ্বিতীয় সত্তা হয়ে উঠেছেন। শাদা তহবন্দ এবং বকের পাখার মতো শাদা পাঞ্জাবি পরেন।

তাঁর গায়ে গতরে চেকনাই লেগেছে। আগের মিনমিনে ভাবটি আর নেই। লোকজন পরিপূর্ণ আস্থাসহকারে তাঁর হাত থেকে তাবিজ এবং পানিপড়া গ্রহণ করে। আলি কেনানই তো ইমাম সাহেবের প্রাণে ফুৎকার দিয়ে তার ভেতর থেকে একজন ব্যক্তিত্বকে টেনে বের করে এনেছে। পাশাপাশি একটা ভয়ও আলি কেনানের আছে। তাবিজকবজ পানিপড়া দেয়া ইমাম সাহেবেরই পেশা। আলি কেনান একজন বহিরাগত। একনাগাড়ে বেশিদিন যদি সে অনুপস্থিত থাকে তা হলে ইমাম সাহেব তাকে একদিন বেদখল করতে পারে। মক্কেলদের সঙ্গে ইমাম সাহেবের সরাসরি সংযোগ ঘটে গেছে। তিনি ইচ্ছে করলে তাকে বেদখল করতে পারেন। আলি কেনান জানে ইমাম সাহেবের দিলে এখনো তেমন হিম্মত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মানুষের বদলে যেতে কতক্ষণ। এসব তো গেল বাইরের কথা। কেন সে ফুলতলি ছেড়ে যেতে এখনো প্রস্তুত নয়, তার অন্য একটি গভীর কারণও আছে। সে আর ছমিরন ছাড়া সেকথা কেউ কোনোদিন আঁচ করতে পারবে না। ছমিরনের সঙ্গে অবাধ গোপন মিলনে ব্যাঘাত ঘটে এমন কোনো কাজ সে করতে পারবে না। প্রাণ গেলেও না।

আলি কেনানের জীবন অত্যন্ত মসৃণভাবে চলে আসছে। সত্যি বলতে কী সে নিজেকে মনে মনে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করেছে। কেননা সে যা করতে চাইত আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত প্রকৃতি তার একান্ত সংগোপন মনের কথা যেন শুনতে পেত। কোনো কোনো রাত্রিবেলা উন্মুক্ত আকাশের গ্রহনক্ষত্রের দিকে তাকালে তার আকাঙ্ক্ষার বেগ এত প্রবল, এত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যে তার মনে হয় সে গ্রহনক্ষত্রের গতি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে অনুভব করে তার চেতনায় বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যাচ্ছে। যে-কেউ তাকে স্পর্শ করবে তার শরীরেও বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হবে। এইরকম সুখের সময়টিতে ছোট্ট একটি ঘটনায় তাকে চাঁদের অপর পিঠ দেখতে হল। একদিন সন্ধেবেলা সে হুজরাখানায়

শুয়ে ছিল। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। তা ছাড়া আকাশটাও ছিল মেঘলা। মেঘ করলে অকারণে আলি কেনানের মন বিগড়ে যায়। তাই কোথাও বের হয়নি।

নারীকণ্ঠের একটি খিলখিল হাসি তার কানে আসে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে ছমিরনের মেয়ে আনজুমন। আনজুমন তো বটেই, কিন্তু সে হাসাহাসি করছে কার সঙ্গে। ভালো করে চেয়ে দেখে জেলফেরত আসামি কালাম আনজুমনের একটা হাত ধরে আছে। আর আনজুমন কখনো খিলখিল করে হেসে তার দিকে ঝুঁকছে, কখনো সরে আসছে। টিমটিম করে জ্বলা বাতিটির আলোয় আলি কেনান আনজুমানের মুখ দেখতে পায়, দেখতে পায় তার পরিণত স্তনগুলি। ছমিরনের মেয়ে আনজুমান এত সুন্দর! আলি কেনানের মাথায় তৎক্ষণাৎই রক্ত চড়ে যায়। তার ইচ্ছে হয়েছিল, দুটোকেই কেটে গাঙের পানিতে ভাসিয়ে দেয়। সে তুলকালাম কাণ্ড করে বসত, কিন্তু নানা কথা ভেবে সে চুপ করে গেল। আজকাল তাকে অনেক কিছু বুঝে সমঝে চলতে হচ্ছে। একটা সামান্য ভুলের জন্য যদি পাড়ায় প্রচার হয়ে যায় তার এখানে কেষ্টলীলা চলছে, তা হলে তাকে বেশ বিপদের মধ্যে পড়তে হবে। মানুষের আস্থাই তো এই পেশার একমাত্র অবলম্বন। আগপাছ নানা কথা চিন্তা করে মনের রাগ মনের মধ্যে হজম করে ফেলল।

সেদিন রাতে ছমিরন তার ঘরে এলে আলি কেনান বিস্ফোরণ ঘটায়: মাগি খবর রাহস তর মাইয়া ঘরে লাঙ ঢুকাইবার শুরু করছে।

কথার পিঠে কথা বলা ছমিরনের অভ্যাস নয়। সে আলি কেনানকে একজন অসাধরণ মানুষ বলে মেনে নিয়েছে। আলি কেনান তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করে। আপত্তি করেনি কোনো ব্যাপারে। এত বড় একজন মানুষ আলি কেনান, সেকথা মনে করে ছমিরন আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। তার ওই আত্মসন্তুষ্টির আরো একটা কারণ আছে। সে মনে করে দুনিয়ার সব পুরুষ একরকম। তার দীর্ঘ জীবনের এটাই

অভিজ্ঞতা। আলি কেনানকে সে অন্যরকম মনে করেছিল। এখন বিজয়িনীর একটা গোপন পুলক সে অনুভব না করে পারে না। পেটের মেয়ে আনজুমনকে ছমিরন ভীষণ ভালোবাসে। তার সন্তান ওই একটাই। ওই মেয়ের জন্য সে জীবনে অনেক কষ্ট করেছে। তার নামে এসব কথা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সরাসরি প্রতিবাদ না করেও বলল, এইডা কী কন আপনে? আপনেরে আমার আনজুমনের নামে কেউ কিছু লাগাইছে নি? আলি কেনান বলল,

মাগি লাগাইব কেডা, আমি হাঁঝবেলা আপন চউকে দেখছি তর মাইয়া কালাম হারামজাদার লগে হাইস্যা হাইস্যা কতা কইতাছে। আর হে তর মাইয়ার বুনি টিপতাছে। একটু বাড়িয়ে বলল।

আপনে আপন চউকে দেখছেন?ছমিরন জানতে চাইল।

মাগি তর লগে মিছা কতা কইতাছি নাকি। আমি কি মিছা কতা কই?

এবার ছমিরন মেয়ের পক্ষ সমর্থন করে বললো,

মাইয়া আমার অত খারাপ না। আপনের মানুষগুলান অরে খারাপ করবার চাইছে। আপনে হেগোরে দাবড়াইয়া দিবার পারেন না ?

আলি কেনান ছমিরনকে কখনো মুখে-মুখে কথা বলতে শোনেনি। আজ তক্য করবার প্রবৃত্তি দেখে বলল,

মাগি তর মাইয়া অত খারাপ না! কাপড় খুইল্যা দেখ। গাঙ বানাইয়া দিছে। হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে সে ছমিরনকে একটা চড় দিয়ে বসে। চড় খেয়ে মেয়েমানুষটি ঘুরে পড়ে যায়। তার সব শঙ্কা, সব দ্বিধা কোথায় চলে যায়। সে আলি কেনানের চোখে চোখ রেখে তেজের সঙ্গে বলল,

মাইয়া লাঙ ঢুকাইছে, বেশ ভালা করছে। আপনেও তো আমার লাঙ। তয় কী অইছে? ভবিষ্যতে কিছু দেখলে মুখ বন্ধ কইর‍্যা থাকপেন। আপনে মুখ খুললে আমিও খুলুম। আল্লাহ্‌ আমারেও জবান দিছে হেইডা মনে রাইখেন। ঝাড়ুটা পা দিয়ে সরিয়ে সে হুজরাখানা থেকে বেরিয়ে এল। নিজের ঘরে গিয়ে আনজুমনকে মারতে মারতে একদম মাটিতে লুটিয়ে দিল। আলি কেনানের আফসোস হতে থাকল,

ছমিরনকে চড়টা দিয়ে সে ভালো করেনি।

তার পরদিন মনে পাথরের মতো একটা অপরাধবোধের বোঝা নিয়ে আলি কেনানের ঘুম ভাঙে। রোজকার অভ্যেসমাফিক আজকেও ছমিরন এসে হুজরাখানা ঝাঁট দিয়ে গেছে। চোখাচোখিও হয়েছে। কিন্তু দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়নি। মাত্র এক রাতের ব্যবধানে তারা একে অন্যের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলি কেনান তার আলখাল্লা পরল। লোকজনদের দর্শনও দিল। তবে কারো সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলা সম্ভব হল না। সে মনে করতে লাগল চারদিকের মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা। মাঝে মাঝে আলি কেনানের মনে হত অসীম ক্ষমতা তার। শরীরের মধ্যে কোথাও একজোড়া পাখা জন্ম নিয়েছে। ইচ্ছে করলে সে উড়ে যেতে পারে। বুকের ভেতর থেকে একটা বোধ বুদ্বুদের মতো জেগে তার সমগ্র সত্তা আচ্ছন্ন করে ফেলল। আহা তার পাখাজোড়া কাটা পড়েছে। এখন সে নেহাতই ধুলোর জীব। সরীসৃপের মতো বুকে ভর দিয়েই তাকে ধুলোর উপর দিয়ে চলতে হবে।

তার চোখ পড়ল কালাম, জেলফেরত দাগি আসামি কালাম কবরের ওপাশে বসে বিড়ি টানছে। আড়চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আলি কেনান বুঝতে পারে তার চোখ আনজুমনকে তালাশ করছে। দুয়েকবার তার সঙ্গে চোখাচোখিও হল।

আলি কেনান আঁচ করতে পারে কালাম তার দিকে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে। তার অর্থ আলি কেনানের কাছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ।

তুমি যদি মায়ের সঙ্গে ঘুমোতে পার আমি মেয়ের সঙ্গে আশনাই করতে পারব না কেন? তোমার যেমন ক্ষুধা আছে আমারও তেমনি ক্ষুধা। তোমাতে আমাতে তফাত কোথায়? আহা আলি কেনান এক জায়গায় কালামের সমান হয়ে গেল। তার চাইতে মৃত্যু তার জন্য ভালো ছিল।

মিরপুর মাজারের দুই বগলে লাঠি ভর দেয়া বুড়োটির কথা তার মনে পড়ে গেল। বুড়ো একরাতে আপনমনে গুনগুন করে গান গাইছিল:

'ফকিরি সহজ কথা নয়। লম্বা চুলে তেল মাখিলে ফকিরি পাইতা নয়।' তার দিকে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে তাকিয়ে বলেছিল:

অ মিয়া ফকিরি করবার ত খুব ভঙ্গিটঙ্গি করতে আছ, ফকিরির মানে বোঝ? আলি কেনান জবাব দেয়নি। সে ফকিরির অর্থ বোঝে না। বুঝতেও চায় না। কিচ্ছু না জেনে, না বুঝে তার দিনকাল তো মন্দ কাটছে না। অধিক কী প্রয়োজন? সেই বুড়ো যাকে আলি কেনান মনে মনে ভয় পায় এবং ঘৃণা করে, কাটাকাটা ভাষায় বলেছিল:

বাইচ্যা থাকার এক শ একটা পথ আছে, সময় থাকতে বাইছ্যা লও একটা। এই পথ তোমার নয়। ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে চলা। তুমি পারবা না, একবার পিছলাইয়া গেলে বুঝবা পরিণাম। ফকিরি অইল গিয়া মিয়া অনন্ত অসীমেরে কোলে লইয়া হগল সময় বইস্যা থাকা। আল্লারে চামড়ার চউকে কেডা দেখছে। এই অনন্ত অসীমই তো আল্লাহ্ । আমাগো দ্বীনের নবি মেরাজ গেছিলেন। হেইড্যা আর কিছু নয়, অনন্ত অসীমের মধ্যে লয় অইয়া গেছিলেন।

আলি কেনান মনে করে এসেছে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত মাজারের পেছনে তার মতো করিতকর্মা কোনো মানুষের ফন্দিফিকির কাজ করেছে। আসল বস্তু কিছু নেই। আজকে তার চিন্তার সীমাবদ্ধতা কে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। কিছু-কিছু মানুষ দুনিয়াতে ছিল বা এখনো আছে যাঁরা অনন্ত অসীমকে কোলে নিয়ে জিন্দেগি কাটিয়ে দিতে পেরেছেন । এই ধরনের কিছু মানুষ দুনিয়াতে ছিলেন বলেই আলি কেনানের মতো মানুষেরা ফন্দিফিকির করে বাঁচতে পারে। ফকিরি করার ভান করে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে যেতে পারে। আলি কেনান অনুভব করে অত ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা তার নেই। দুর্বল পা তাকে অত দূরে নিয়ে যেতে পারবে না। তার কাদার পা।

একদিন বিহানবেলা ছমিরনের কান্নার শব্দ শুনে তার ঘুম ভাঙে। মেয়েমানুষটি বুক চাপড়ে কাঁদছে :

হায়রে আল্লাহ, আমার এত বড় সর্বনাশ কেডা করল। আমার নাবালেগ মাইয়ারে জাদুটোনা কইর‍্যা কেডা লইয়া গেল।

আলি কেনান বুঝতে পারে, কালাম, হ্যাঁ কালামের কাজ। ওই হারামজাদাই ছমিরনের মেয়েটি নিয়ে ভেগেছে। প্রথমে তার ভীষণ রাগ হল।

কালামকে চরম শাস্তি দেয়ার সংকল্পে তার হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে। আনজুমনকে সেদিন দেখার পর থেকে তার রক্তে রক্তে একটা অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে একটা বিষয় বিবেচনা করে মনকে সংযত করতে হল আনজুমন তো তারই বাড়ির পোষা মুরগি। একসময়ে আপনা থেকেই তার হাতে এসে পড়বে। একটা বিরাট পরাজয় তার ঘটে গেল। চিৎকার করে আকাশ-পাতাল তোলপাড় করার মতো ভাবাবেগ তার জন্মেছিল। কিন্তু অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে চুপ করে থাকল।

আলি কেনান তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বুঝে ফেলল, তার ক্ষয় শুরু হয়েছে। এই ফুলতলিতে থাকলে সে আর পতন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাকে নতুন জায়গা খুঁজে বের করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। স্বভাবতই নিমবাগানের চিন্তাটাই তার মনে এল। বেলা বাড়লে শিষ্যদের ডেকে বলল,

কলন্দর বাবা খোয়াবে আইস্যা কইয়া গেছেন, ইহান থাইক্যা দুই দিনের মধ্যি নিমবাগানে চইল্যা যাইতে অইব। সে কথা না বাড়িয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েই বসল। শিষ্যেরা পূর্বঅভিজ্ঞতা থেকে জানে বু আলি কলন্দর বাবার নির্দেশ হেরফের করবার উপায় নেই। একমাত্র ছমিরনই বুঝতে পারল আলি কেনান পালাচ্ছে। এ ছাড়া তার আর উপায় কী? দুদিন বাদে আনজুমন আর কালামের কথা উঠবে। নাড়াচাড়া পড়ার আগেই কেটে পড়ছে। সে কী করবে? হ্যাঁ, তাকেও যেতে হবে বৈকি। বুকটা ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু আলি কেনানের সঙ্গে সে নিশির অদৃশ্য বাঁধনে আটকা পড়েছে। সেখান থেকে পালাবে কোথায় ?

৬

নিমবাগান মাজারে এসে আলি কেনান নতুনভাবে গুছিয়ে নিতে আরম্ভ করেছে। মাজার- প্রাঙ্গণেই একটা বড়সড় চালাঘর উঠিয়ে নেয়। নাম ফেটে গিয়েছিল। তাই বেড়ার ঘরে টিনের ছাউনি দিতে বিশেষ অসুবিধে হল না। নিমবাগান মোটামুটি সম্পন্ন এলাকা। ধর্মপ্রাণ মানুষেরা খোরাসানি বাবার গত ওরসটিকে আলি কেনানের একটা বিশেষ কেরামতি বলে ধরে নিয়েছে। সুতরাং আলি কেনানের কোনো দাবি, কোনো অভাব তাদের কাছে অপূর্ণ থাকার কথা নয়

একধরনের নিষ্ক্রিয়তা আলি কেনানের শরীরে ভর করেছে। গায়ে গতরে মেদও জমতে আরম্ভ করেছে। সর্বক্ষণ তার হাঁসফাঁস লাগে, কিন্তু নিমবাগানের

অধিকাংশ মানুষ আলি কেনানের এই আকস্মিক শারীরিক পরিবর্তনকে তার পবিত্রতার চিহ্ন বলে মনে করতে থাকে। এটাও খুব আশ্চর্যের ব্যাপারে নয়। এই দেশের অলস নিষ্ক্রিয় মানুষেরা সব সময়ে সাধুপুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। কিন্তু আলি কেনানের মনের ঝড় থামে না। মিরপুর মাজারের বুড়োমানুষটার কথা তার মনে হানা দিয়ে জাগ্রত হয়। তার ভেতর একটা আলো ছিল। খুব নির্জন মুহূর্তে সে অনুভব করত, ধোঁয়া বাষ্পের গভীরে অন্তরে ঘৃতের প্রদীপের মতো কী একটা জ্বলছে। এখন সে অনুভব করে সে-আলোটা আর তার ভেতরে নেই । নতুন কর্মের প্রেরণা তাকে আর তাড়িত করে না। চোখের জলে তাকে স্বীকার করতে হয়, মানুষের মধ্যে আসমানের মতো উঁচু, পর্বতের মতো দৃঢ় কতিপয় বস্তু আছে, সারাজীবন সন্ধান করলেও সেগুলোর নাগাল সে পাবে না। সে গর্তের জীব গর্তের ভেতরই তাকে থাকতে হবে। তবু আলি কেনান ভেবে অবাক হয় তার মতো মানুষের মনেও একসময় অমর হওয়ার বাসনা মুকুল মেলেছিল। আহা তার জীবনে বসন্ত শেষ হয়ে গেছে। অন্তরের আলোতে পথ কেটে চলা তার পক্ষে অসম্ভব। এখন থেকে লাঠির ওপর ভর করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। নিজেকে ভারবাহী পশুর মতো মনে হয়। একেকটা দিন আসে আর যায়। সে জড়পিণ্ডের মতো পড়ে থাকে। আগে অন্তর থেকে সে পেত কর্মের প্রেরণা। সেই প্রেরণার বলে বাইরের জগতে তরঙ্গ সৃষ্টি করত। অন্তরের আগুন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসত। সে আগুনে আত্মাহুতি দেয়ার জন্যে ছুটে আসত মানুষ। আলি কেনানের জীবনধারণের সমস্ত উল্লাস অবসিত হয়ে এসেছে।

এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে সে খুঁজে পায় না। সে অনুভব করে হাড়ে-মাংসে অস্থি-মজ্জায় সে ভোলার লাঠিয়াল। জীবন তার কাছে একটা উৎসববিশেষ। এভাবে সে কী করে বেঁচে থাকবে? ভেতর থেকে প্রেরণা আসছে না বলে সে এমনভাবে স্থাণুর মতো বসে থাকতে পারবে না। বাইরে থেকে প্রেরণার সন্ধান

করতে হবে। নিজের অন্তরের শৃঙ্খলা বাইরে আরোপ করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তাকে বাইরের শৃঙ্খলার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

উনিশশো উনসত্তর সাল শেষ হয়েছে। সত্তর সালেরও মাঝামাঝি অতীত প্রায়। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনটি ভীষণ বেগবান হয়ে উঠেছে। জয়বাংলা ধ্বনির একাধিপত্য গোটা দেশটিকে ঢেকে রেখেছে। সকালে জয়বাংলা, দুপুরে জয়বাংলা, সন্ধেয় জয়বাংলা, এমনকি রাত্রির গভীর অন্ধকারে জয়বাংলা ধ্বনি কামানের গোলার মতো ফেটে পড়ে। যে-শিশুর মুখে সদ্য কথা ফুটতে আরম্ভ করেছে, মা-বাবা উচ্চারণ করার আগে জয়বাংলা শব্দ দিয়ে কথা বলা শুরু করে।

আলি কেনান চিন্তা করে দেখল এটা একটা সময় এবং সুযোগ বটে। এই তীব্র স্রোতের খরতরঙ্গে সে ভেসে পড়তে পারে। এই প্রচণ্ড ধারাস্রোত তাকে টেনে টেনে নিয়ে যাবে। এই জয়বাংলা ধ্বনির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার একটা ব্যক্তিগত কারণও সে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে। গভর্নর সাহেবকে সে একবার প্রাণে বাঁচিয়েছিল। আর সেই গভর্নর সাহেবই তাকে রাস্তায় উলঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আলি কেনানের মনের ভেতর তাঁর প্রতি একটা ঘৃণা শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে আছে। এতদিন সেকথা মনেই হয়নি। এখন চিন্তা করে দেখল এই জয়বাংলার মানুষদের সঙ্গে যদি নেমে পড়ে তা হলে একটা প্রতিশোধও নিতে পারবে। গভর্নর সাহেব নিজেও এখন গভর্নর হাউজে নেই। আইয়ুব তাঁকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা থেকে বাধ্য হয়ে নিজেও সরে গেছেন। তবু গভর্নর সাহেব গুলশানের রাজবাড়ির মতো বাড়িতে বহাল তবিয়তে আছেন । আলি কেনানের একান্ত ইচ্ছে একবার গভর্নর সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়াবে। বলবে, আমার নাম আলি কেনান। একদা আপনি যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পেছনে আলখাল্লা পরা যাদের দেখছেন এরা সবাই আমার শিষ্য। এখন আমি জয়বাংলার দরবেশ। আমার কথায় এরা প্রাণটি পর্যন্ত

বিলিয়ে দেবে। কিন্তু আপনার কথায় এই বাংলাদেশে একটা কুত্তাও ঘেউ করবে না। এই খবরটি জানিয়ে দিতে কষ্ট করে আপনার কাছে এলাম।

আলি কেনান এখন অনেক চাঙা হয়ে উঠেছে। মনের বিমর্ষতা কেটে গেছে। তাকে ভেবেচিন্তে আর কাজ খুঁজে বের করতে হয় না। কাজ পায়ে হেঁটে তার কাছে এসে হাজির হয়। নিমবাগানের ছেলেরা মাজার প্রাঙ্গণে অফিস করেছে। অধিক রাতে রাস্তায় পোস্টার লাগিয়ে কিংবা মিছিল করে আর ঘরে ফেরা সম্ভব হয় না। তাকে ডেকে বলে, দরবেশ বাবা বাড়ির দরোজা বন্ধ হয়ে গেছে। আজ রাতে তোমার এখানে ঘুমোতে হবে। আর থাকলে কিছু খেতে দাও। আলি কেনান বলে, তরা যত ইচ্ছা খা। আর যতক্ষণ মন লয় ঘুমাইয়া থাক। বাবার দরজা তোগো লাইগ্যা কুনুদিন বন্ধ অইব না। কেবল হপ্তায় হপ্তায় চাইল, ডাইল বাজার থন উডাইবি। গভীর রাতে আলি কেনানের আস্তানায় রান্না চড়ানো হয়। ছেলেরা আলুভর্তা আর ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে তারা বেরিয়ে যায়। দুপুরে আরেক দল আসে। তারপর আরেক দল। আলি কেনানের আস্তানাটি জয়বাংলা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। সে একরোখা স্বভাবের মানুষ। দশজনের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে কাজ করার বিশেষ অভ্যেস তার নেই। এই সমস্ত পিচ্চি পিচ্চি পোলাপান ধমক দেয়, চোখ রাঙায় । তা মাঝে মাঝে আলি কেনানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। সে সব সময় হুকুম দিয়ে অভ্যস্ত এবং হুকুম পালন করতে হলেও একজনের বেশি কর্তা সহ্য করতে পারে না। আগে গভর্নর সাহেবের হুকুম মেনে কাজ করতে পারলে খুশি হত। শেখ সাহেবকে সে আজকাল পছন্দ করতে আরম্ভ করছে। কেননা শেখ সাহেব গভর্নর সাহেবের সঙ্গে টক্কর দিয়ে তাঁকে চিত করে ফেলেছেন। একটা বাঁশের মাথায় উঁচু করে শেখ সাহেবের ছবি টাঙিয়েছে বটে, কিন্তু তার সমস্ত কাজকর্ম মেনে নিতে পারে না।

আলি কেনান আগে গভর্নর সাহেবকে নানা বিষয়ে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছে এবং সংগত কারণেই শেখ সাহেবকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার অধিকার তার আছে। কিন্তু শেখ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার ক্ষীণতম সম্ভাবনাটিও আলি কেনান দেখতে পায় না। নিজের ওপর বিরক্ত হয়। শেখ সাহেব তাকে এ কী পরিস্থিতির মধ্যে ছুড়ে দিয়েছেন। দুধের বাচ্চাও তাকে হুকুম করে, দরবেশ বাবা এটা করো ওটা করো। তার বর্তমান দুর্ভাগ্যের জন্য মনে মনে শেখ সাহেবকেই দায়ী করে। মনকে এই সান্ত্বনা দেয় যে, আলি কেনান যখন তর নিজের ভিতরে নুর নাই বাইরে ধুঁয়া থেইক্যা নিশ্বাস টানতে অইব। গোস্বাটোস্বা কইরা আর কী লাভ?

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তার একটা সাংঘাতিক অনুযোগ আছে। শেখ সাহেব জয়বাংলা করতে চান ভালো, বিহারি পাঞ্জাবিদের খেদিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে চান আরো ভালো। সেইজন্যই তো আলি কেনান তাঁর দলে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তিনি ফকিরনির পোলাদের বুকে সাহস দিয়ে এমন বেয়াদব করে তুলেছেন, এটা ঠিক না। ফকিরনির পোলারা ফকিরনির পোলাই। যেহেতু নিজেকে জয়বাংলার দরবেশ বলে ঘোষণা করেছে তাই আলি কেনান মনে করে শেখ সাহেবের সঙ্গে রাগ, অভিমান করার অধিকার তার আছে। আলি কেনান বুঝে নিয়েছিল ছোকরাদের মন জুগিয়ে চলা তার কর্ম নয়। তারা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তার কোনো হদিশ নেই। সে নিয়মিত সংবাদ পাচ্ছে এখানে গুলি হচ্ছে, ওখানে ধরপাকড় চলছে। পাকিস্তান থেকে উড়োজাহাজে করে লাখো লাখো সৈন্য আসছে। কখন কী ঘটে বলা যায় না। আলি কেনান হুশিয়ার মানুষ। তা ছাড়া মনের গভীরে এই বাঙালিদের সে মানুষ বলে মনে করে না। গভর্নর হাউজে থাকার সময় এই একটা জিনিস তার উপলব্ধির মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল যে পাকিস্তানিরাই হল আসল মানুষ, আর বাঙালিরা সব চুতিয়া। কেউ তাকে বলে দেয়নি। কিন্তু এই ধারণাটি তার মনে জন্ম নিয়েছে।

পরিস্থিতির চাপে নিজেকে জয়বাংলার দরবেশ ঘোষণা করেছে বটে, কিন্তু জয়বাংলার মানুষদের সঙ্গে সে অধিক দূরে যেতে চায় না।

একদিন আলি কেনান নিমবাগানের প্রভাবশালী কজন ছোকরার সামনেই শিষ্যদের কাছে বলল,

বাবা বু আলি কলন্দর আবার স্বপ্নে দর্শন দিয়া কইছেন, বিহারি আর পাঞ্জাবিরা নাপাক জন্তু। তাদের বাংলার মাটি থেইক্যা তাড়াইয়া দেওন লাগব। সেজন্য বাবায় কইছেন জয়বাংলার নিশান নিয়া মাজারে মাজারে যাওয়া লাগব। শিষ্যরা বু আলি কলন্দরের স্বপ্নের ব্যাপারে কোনোদিন কোনো আপত্তি করেনি। আজকেও করল না। আলি কেনান বলল,

বাজান আরো একটা কথা কইছেন। শিকল পরা বাদ দিয়া জয়বাংলার নিশান বইতে অইব এবং সব জায়গায় বঙ্গবন্ধুর ছবি নিয়া যাইতে অইব। সবদিক রক্ষা পাওয়ার মতো এরকম একটি মৌলিক পরিকল্পনা তার মাথায় এসেছে, সেজন্য নিজেকে ধন্যবাদ দিল।

ছোকরাদের সঙ্গ ত্যাগ করে জয়বাংলার পতাকা এবং শেখ মুজিবের ছবি নিয়ে মাজারে মাজারে ঘুরতে আরম্ভ করল। আলি কেনান বুঝতে পারেনি যে এই ছোকরাদের সঙ্গে থেকে তার শিষ্যদের মধ্যেও একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। মাজার পরিক্রমার দ্বিতীয় দিনে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তাকে আবিষ্কার করতে হল একসঙ্গে চারজন শিষ্য কোথাও কেটে পড়েছে। অনেক খোঁজখবর নিয়েও কোনো কূলকিনারা করতে পারল না। এখন তার সঙ্গে শুধু ফুলতলির কিশোরটি আছে। আলি কেনান তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য পুরোপুরি বর্তমান পরিস্থিতিকেই দায়ী করল। রাগে দুঃখে অপমানে তার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সে রাতে আর নিমবাগানে ফিরতে প্রবৃত্তি হল না। মিরপুর মাজারেই রয়ে গেল।

সন্ধে গড়িয়ে গেল। মিরপুর মাজারের সেই বুড়োটির সঙ্গে আবার তার সাক্ষাৎ হল। বুড়ো পরিহাসমিশ্রিত ভাষায় জিগগেস করল, অ মিয়া, দেখছি শিকলটিকল সব খুইল্যা ফেলাইছ। হাতে কী? আর বুকে ঝুলাইছ এইড্যা কী? আলি কেনান বলল:

হাতে জয়বাংলার নিশান আর বুকে মুজিবের ফটো। বুড়ো বলল, মিয়া ভং চং ত বেশ করতাছ । টের পাইবা আর দেরি নাই।

সেটা ছিল পঁচিশে মার্চের রাত। সেই রাতেই নিথর নিদ্রিত ঢাকা নগরীর বুকে বন্দুক, কামান, ট্যাংক নিয়ে প্রচণ্ড হিংস্রতায় পাকিস্তানি সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। আলি কেনান ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে মনে করেছিল, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাস্তায় মশাল জ্বালিয়ে একটা মানুষেরই খোঁজ করছে, তার নাম আলি কেনান। একনাগাড়ে চারদিন মিরপুর মাজারে অবস্থান করতে হল আলি কেনানকে। পঞ্চম দিন পাকিস্তানি সৈন্যদের আক্রমণধারা একটু শিথিল হতেই সে মনস্থ করল নিমবাগান ফিরে যাবে। ডানে-বাঁয়ে খোঁজ করল কিন্তু ফুলতলির কিশোর শিষ্যটির কোথাও দেখা পেল না। সুতরাং একাই তাকে পথে বেরোতে হল।

এই পাঁচদিনে শহরের কী চেহারা হয়েছে দেখে তার কান্না পাচ্ছিল। বাড়ির ছাদে আর জয়বাংলার নিশান ওড়ে না। রাস্তায় মানুষজনের কোনো চিহ্ন নেই। কী ভূতড়ে পরিবেশ। এখানে-ওখানে মানুষের লাশ পড়ে আছে। মিলিটারি আর সাঁজোয়া গাড়ি রাস্তায় টহল দিচ্ছে। আলি কেনান উপলব্ধি করল শেখ মুজিবের বারোটা বেজে গেছে । এই অবস্থা হবে সেটা সে জানত। ফকিরনির পোলাদের নিয়ে শেখ মুজিব রাজা হতে চেয়েছিল।

সে যখন নিমবাগান মাজারের কাছে এল তার চোখ ফেটে পানি এসে গেল। তার থাকার ঘর এবং জয়বাংলার অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে। পোড়ামাটির গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। সবশেষে মাজারের ভেতরে ঢুকে আর কী হবে। উলটোদিকে

পা বাড়িয়েছিল - পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে দাঁড়াল। সেই পুরোনো খাদেম। চোখে প্রতিহিংসা চকচক করছে:

অ মিয়া কই যাও, আইয়ো ভেড়ার গোশত খাইয়া যাও। ভেড়া পাক জন্তু, আমাগো নবি করিম ভেড়ার গোশত খাইতে পছন্দ করতেন। আলি কেনান ভালো করে তাকিয়ে দেখে শ্বেতকরবী গাছের নিচে হোগলা বিছিয়ে বিশ-পঁচিশজন মানুষ খেতে বসেছে। তাদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা তার কানে এল। উর্দুতে কথাবার্তা বলছে। খাদেম মুহম্মদপুর থেকে বিহারিদের ডেকে এনে তার ভেড়া দুটো জবাই করে খাওয়াচ্ছে। আর ছমিরন বাসনপত্তর ধুয়ে দিচ্ছে। সব তো শেষ। আর কেন? সে উলটোদিকে ফিরে হাটতে আরম্ভ করল। কিছু দূর গিয়ে সে দেখে একটি রোগা ঘেয়ো কুকুর তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সেই কুকুরছানাটি যেটাকে সে একদিন পেটে লাথি দিয়ে ফেলে চলে গিয়েছিল।

৭

উনিশশো বাহাত্তর সালের মাঝামাঝি দিকে আলি কেনান নিমবাগান মাজারে আবার ফিরে আসে। যুদ্ধের এই ন-মাস কোথায় ছিল, কী অবস্থায় ছিল কেউ তা জানে না। ভীষণ কৃশ হয়ে গেছে আলি কেনান। শরীরের মেদ একবিন্দুও নেই। তাকে চকচকে কষ্টিপাথরের মূর্তির মতো দেখাচ্ছে। নিকষ কালো রং যেন শরীর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। চুল দীর্ঘ হয়ে জটার মতো হয়েছে। গায়ের রঙিন লুঙ্গি আলখাল্লা নেই। একটি শাদা লুঙ্গি এবং চাদর তার পরনে।

নিমবাগান এলাকার মানুষ আলি কেনানকে বীরের সম্মান দিয়েই গ্রহণ করল। এই এলাকার মানুষের আলি কেনানের প্রতি বাড়তি এ অনুরাগ, তার কারণ আছে।

আলি কেনান জয়বাংলার দরবেশ। তার অবর্তমানে এ মাজার পুরোনো খাদেম দখল করেছিল। এলাকার লোকদের প্রতি খাদেমের একটা তীব্র বিদ্বেষ ছিল। কেননা তারা আলি কেনানকে নানা ব্যাপারে সাহায্য করেছে। সেজন্য খাদেম সব সময় মুহম্মদপুর থেকে বিহারিদের ডেকে আনত। এলাকাবাসীদের ভীতিপ্রদর্শন করাত। রাজাকারদের আনাগোনা ছিল নিয়মিত। নিমবাগানের মানুষ সব সময় সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকত কখন খাদেম কী বিপদ ঘটায়। নিমবাগানের একজন প্রবীণ বললেন,

আমাদের বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরা আইলেন, বাবাও মাজারে আইলেন। আলি কেনান মনে করল এই তুলনা একান্তই যুক্তিসংগত। তার পর থেকে আলি কেনানের চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ নতুন একটি খাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। কাউকে বলবার সাহস তার নেই। মর্মের গভীরে ধরে নিয়েছে শেখ মুজিব জয়বাংলার নেতা এবং সে নিজে জয়বাংলার দরবেশ। এতকাল বাবা বু আলি কলন্দর-এর সঙ্গে যে কাল্পনিক সম্পর্ক সে প্রতিষ্ঠা করেছিল এই সম্পর্ক তার চাইতে অনেক জোরালো। কেননা এর বাস্তব ভিত্তি আছে। শেখ সাহেব যেমন সব ব্যাপারে হুকুম দিচ্ছেন, তেমনি হুকুম দেয়ার অধিকার তারও আছে।

আলি কেনানের সঙ্গে পূর্বের লোকজন নেই। যা-কিছু অর্জন করেছিল, সব হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে। পরোয়া করে না আলি কেনান। মানুষের জীবনে এরকম তো কতই ঘটে। কেউ না থাকুক, কিছু না থাকুক আলি কেনানের অদম্য মনোবল আছে। দিব্যদৃষ্টি প্রসারিত করে সে দেখতে পায় সামনের সময়টা তার। এই সময়কেই সে চাষ করবে। সময়ের গর্ভে সৌভাগ্য তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তখনকার সময়টা ছিল ভীষণ টালমাটাল। দশ কোটি মানুষের একটা দেশের তাবৎ মানুষের সামাজিক বন্ধন আলগা হয়ে পড়েছে। সমাজের তলা থেকে প্রচণ্ড একটা গতিশীলতা জাগ্রত হয়ে গোটা সামাজিক কাঠামোকেই কাঁপিয়ে তুলেছে। পুরোনো

যা-কিছু ছিল ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এ এমন একটা পরিস্থিতি উচ্চ চিৎকার করে না বললে কেউ কারো কথা পর্যন্ত কানে তোলে না। আলি কেনান এলাকার ছেলেদের সহায়তায় খুব সহজে একটা মাইক্রোফোন যন্ত্র জোগাড় করে ফেলল। এক শুক্রবার জুমার নামাজের পর ঘোষণা করে, এই বাংলাদেশে আমি আর শেখ মুজিব ছাড়া আর কুনু বাঘের বাইচ্চা নাই। শেখ সাহেবের কতা যেমন হগলে হুনছে, হেইরকম আমার কতাও হুনন লাগব। অনেক লোক জুটেছিল, কেউ আলি কেনানের কথার বিরোধিতা করল না।

আলি কেনানের সাহস বাড়তে থাকে দিনে দিনে। প্রতিদিন সে মাজারের সামনের চত্বরটিতে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ায়। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। চিৎকার করে, অশ্লীল গালাগাল দেয়, কখনো খেলনা পিস্তল দিয়ে লোকজনকে ভয় দেখানোর ভঙ্গি করে। সবদিক দিয়ে সে যেন সময়ের উপযুক্ত প্রতিধ্বনি হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সমাজ-শরীরের ভেতর যতগুলো ধারা উপধারা ক্রিয়াশীল, তার সবগুলোই যেন জীবন লাভ করে আলি কেনানের মধ্যে ঝরনার বেগে ফেটে পড়তে চাইছে। আশ্চর্য, মানুষও তার এই ভূমিকাটি মেনে নিয়েছে। সকলে মনে করছে, এটিই স্বাভাবিক এবং এ হওয়াই উচিত ছিল।

আলি কেনান অসাধ্য সাধন করতে পারে, তার চরণস্পর্শে দুরারোগ্য বাতব্যাধি সেরে যায়। মুখের ফুঁ-দেয়া পানি খেলে শূলবেদনার উপশম হয়, বন্ধ্যা রমণী গর্ভবতী হয়—এমনি কত ধরনের আজগুবি গুজব তার নামে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে মানুষ তার কাছে আসে। যখন খুশি সে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে লেকচার ঝাড়ে, গান গায় যখন খুশি নাচে। এই যুদ্ধে যে ঝোড়োশক্তি বাংলাদেশের অন্তর থেকে মুক্তিলাভ করে সর্বত্র একটা তোলপাড় অবস্থার সৃষ্টি করেছে সেই গতিহীন অন্ধ আদিম শক্তির সবটাই যেন তার শরীরে ভর করেছে। যখন সে নাচে তার চোখ দুটো লাল আরো

লাল হয়ে জ্বলতে থাকে। দিঘল চুলের জটা জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ের পূর্বাভাস রচনা করে। শরীরের বাকে বাকে আদিম ছন্দ মূর্তিমান হয়ে ওঠে। যে দেখে চোখ ফেরাতে পারে না, সম্মোহিত হয়ে যায়।

আলি কেনান জানে না তার এই উন্মত্তার মধ্যেও একটা নিখুঁত সাংসারিক হিসেবনিকেশ আপনা থেকে ক্রিয়া করে যাচ্ছিল। তাকে মানুষ দরাজ হাতে টাকা দেয়। লোকজন তাকে চারপাশে থেকে সব সময় ঘিরে রাখে। মাঝখানে একটি গোলাকার বেষ্টনীর মধ্যে সে নাচে, গান গায়। সেখানে টাকাপয়সার স্তূপ জমে যায়। দশ টাকা, বিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা, একশো টাকার নোট কিছু মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে টাকা কুড়িয়ে নেয়। হিসেব করে কত টাকা হল। তারপর বান্ডিল বেঁধে আলি কেনানের ডেরায় পৌঁছে দেয়। আলি কেনান একেকটি বান্ডিল খুলে হাতের মুঠোতে যা ওঠে লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। বাকি টাকা তোশকের তলায় ফেলে রাখে। এভাবে টাকার বান্ডিল জমতে জমতে তোশকটা উপর দিকে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। আলি কেনানকে কিছুই ভাবতে হয় না। তার চারপাশে আপনা থেকেই একদল ভক্ত জুটে গেছে। তার মধ্যে মেয়েমানুষও আছে। তারা বাবার কাপড় কাচে, তামুক বানায়—মানে গাঁজার কলকি সাজিয়ে দেয়। রান্নাবান্না করে, গা টেপে। তা ছাড়া বাবার আরো কতরকম খেয়ালটেয়াল আছে। পুরুষ ভক্তদের কাজ একটু ভিন্নরকমের। তারা দর্শনার্থীদের সামলায়। সবাই যাতে বাবার কাছে আসতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এলে বাবার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করে। টাকাপয়সার হিসেব রাখে। এমনকি কেউ কেউ গাঁজা চরস এসব নেশার ব্যবসারও তদারকি করে।

এই সময়ের মধ্যে আলি কেনান আস্ত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেল। জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে অনেকগুলো সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। তাতে আলি

কেনানের বিষয়ে অনেকগুলো খারাপ কথাও প্রকাশিত হওয়ায় শিষ্যেরা ঠিক করল, এর পর থেকে তারাই সাংবাদিকদের সমস্ত খবরাখবর সরবরাহ করবে, যাতে বাবার নামে এ ধরনের অপপ্রচার না ঘটাতে পারে। ব্রিটিশ টেলিভিশনের কোনো একটা চ্যানেল আলি কেনানের ওপর একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন করে। সেই ফিল্মের শিরোনাম ছিল 'এ ডারবিশ হু হ্যাজ ওয়ান্ডারফুল সিক্রেট হিলিং পাওয়ার'। এই সংবাদ যেদিন জানা গেল, আলি কেনানের গলার জরির মালাটি চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যে নিলাম হয়ে গেল।

ভদ্রলোকের সন্তানেরা আলি কেনানের নামে পাগল হয়ে উঠল। তারা দলে দলে তার চারপাশে ভিড় জমাতে আরম্ভ করে। আলি কেনান একটা মুক্ত দুনিয়া সৃষ্টি করে নিয়েছিল। এখানে মদ চলে গাঁজা চলে, শিল্পী আসে, কবি আসে, সাংবাদিক আসে। সকলেই আলি কেনানকে প্রেরণার একটা গভীর উৎস হিসেবে ধরে নিয়েছে। গুজব রটেছে ভদ্রঘরের মেয়েরাও আলি কেনানের ওখানে গিয়ে গাঁজা টানে। শহরের এস. পি. আলি কেনানের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। তিনি সেকেল ধরনের মানুষ। তাই তাঁর আশঙ্কা হওয়া খুবই স্বাভাবিক এভাবে চললে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। সবদিক বিবেচনা করে তিনি আলি কেনানকে এক বিকেলে অ্যারেস্ট করে হাজতে চালান করে দিলেন। তারপর শুরু হল হইহই ব্যাপার রইরই কাণ্ড। হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা তাঁর অফিসে টেলিফোন করতে থাকেন। নিমবাগান থেকে মাঝারি ধরনের একটি মিছিল বের হল। মিছিলকারীরা হোম মিনিস্টারের বাড়ির সামনে বসে থাকে। বাধ্য হয়ে হোম মিনিস্টারকে মিছিলকারীদের সঙ্গে দেখা করতে হয়। তিনি আশ্বাস দেন যে আজই দরবেশকে ছেড়ে দেবেন এবং অনতিবিলম্বে এস.পি. -র বদলির অর্ডার ইস্যু করবেন। একদিন পর জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসে আলি কেনান। ভক্তবৃন্দের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে,

তরা মনে রাহিস, আলি কেনান শেখ মুজিব ছাড়া আর কোনো বাপের ব্যাটারে পরোয়া করে না। হে আমারে বুঝে, আমি হেরে বুঝি। হে সমাজতন্ত্রের তরিকার দরবেশ, আর আমি কলন্দরি তরিকার দরবেশ।

এভাবে আলি কেনানের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে কোত্থেকে একটা উৎপাত এসে তার মধ্যে একটা অন্যরকম অস্থিরতার সৃষ্টি করে। এক বিলেতফেরত মহিলা একদিন সন্ধেবেলা আলি কেনানের পা ছুঁয়ে সালাম করে বললেন,

বাবা আমাকে একটু খাস দিলে দোয়া করবেন। আমি ভীষণ বিপদে আছি। আলি কেনান তাকিয়ে দেখল মহিলা অত্যন্ত সুন্দরী। গায়ে দুধে আলতার রং। চুল কোমর অবধি নেমে এসেছে। চোখ দুটো অসম্ভব রকম কালো এবং ভাসাভাসা। বয়স পঁয়ত্রিশটয়ত্রিশ হবে। তখনই আলি কেনানের মনে হল, তার পরনে একটা নেংটিজাতীয় পোশাক ছাড়া আর কিছুই নেই। মহিলার দিকে তাকিয়ে এই প্রথম অনুভব করল সে অর্ধউলঙ্গ। সামনে এমন সুন্দরী এক নারী যার কণ্ঠস্বর এমন কোমল, দৃষ্টি এত গভীর—এরকম একটি নারীর জন্য সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে সে পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যেতে পারে। তার ইচ্ছে হয়েছিল মহিলার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। তার ইচ্ছে হয়েছিল মহিলাকে বলবে,

আমি চুলের জটা কেটে ফেলব। শহরের সবচেয়ে ভালো দোকান থেকে সবচেয়ে সুন্দর দামি জামাকাপড় কিনব। আমার অঢেল টাকা আছে। আমি তোমার সঙ্গে পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে যাব, দয়া করে তুমি আমাকে গ্রহণ করো। কিন্তু আলি কেনানকে বাস্তবে বলতে হল,

বেটি কুনু চিন্তা করবি না, তর উপর বাবা বু আলি কলন্দরের দোয়া আছে। সব দুঃখ বিপদ-আপদ কাইটা যাইব। মহিলা একান্ত ভরসার চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন,

আমার বিপদ-আপদ কেটে যাবে?

আলি কেনান বলল, হ্যাঁ বেটি সব কাইট্যা যাইব।

বাবা আপনার এখানে মাঝে মাঝে এলে আপনি রাগ করবেন?

বেটি তুই আমার মাইয়া, যখন মন লয়, আইবি। মহিলা পা ছুঁয়ে আলি কেনানকে সালাম করে চলে গেলেন।

সেদিন আলি কেনান তার শিষ্য সাগরেদদের অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করে,

শালা খানকির পুত, ভ্যাদাম্যার বাইচ্চারা, আমারে নেংটি পিন্দাইয়া মজা লুটবার লাগছস। চোতমাড়ানির পুতেরা। আমি তগোরে মজা দেখামু। সকলে তার কণ্ঠের অমৃত-বর্ষণ শুনে কেমন জানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। আলি কেনানের কথার পিঠে কথা বলার কারো সাহস হল না। শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছানুসারে দোকান থেকে একজোড়া দামি পাঞ্জাবি কিনে আনা হল। সে নিজের ঘরে গিয়েই পায়জামা পাঞ্জাবি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুলের জটা ধরে টানাটানি করে আর গালাগাল দিতে থাকে: আমার মাথায় জটা ক্যান? খানকির পোলারা। নাপিত ডাইক্যা আন, কাইট্যা ফেলা। সিনেমার হিরোগো মতন কইরা চুল ছাইট্যা দে। সে-রাতে তার সেবা করার জন্য দুটি মেয়ে গিয়েছিল। তাদের পাছায় লাথি মেরে সে বের করে দিল। অন্নজল কিছুই স্পর্শ পর্যন্ত করল না। কেবল আপনমনে আওড়াতে থাকল, আহা কী খুবসুরত, কী দেইখলাম! গঙ্গা-যমুনার পাড়ে খাড়াইয়া য্যান দেখলাম

সুরুজ অস্ত যাইতাছে। দেইখলাম আন্দাররাইতে জঙ্গলের মাঝখান দিয়া চান উঠবার লাগছে। আহা কী দেইখলাম! কী খুবসুরুত।

আলি কেনানের বায়না ছিল সে সিনেমার হিরোর মতো চুল কাটবে। শহরের সেরা দোকানের সবচেয়ে দামি পোশাক পরে মহিলার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। তারপর তার হাত ধরে পৃথিবীর অপর প্রান্তে ছুটে যাবে। কিন্তু পরের দিনও তাকে সেই পুরোনো পোশাকে গিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়াতে হল। নাচতে হল, গান করতে হল। অসহ্য, অসহ্য লাগে আলি কেনানের। যদি পারত তার জীবনের এই বাইরের খোলসটাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলত। কিন্তু পারে না। সে কম্বল ছাড়তে চায়, কিন্তু কম্বল তাকে ছাড়ে না। আসলে কম্বল নয়, ওটা ভালুক। আলি কেনানের নানারকম ইচ্ছে জাগে। কখনো মনে করে সেই মহিলাকে সবলে দুহাতে তুলে নিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় ছুটে যাবে। কখনো ভাবে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মিনতি জানাবে। যে ভক্তি যে আবেগ সে বাবা বু আলি কলন্দরকে দিতে পারেনি সব মহিলাকে উজাড় করে দেবে। কিন্তু প্রতিদিন বাস্তবে ঘটে তার উলটো।

মহিলাটি মাঝে মাঝে তার কাছে আসেন। পা ছুঁয়ে সালাম করেন। প্রাণগলানো স্বরে বাবা বলে সম্বোধন করেন। বর্তমানে মহিলার একটি মানস সংকটকাল চলেছে। তিনি অনেক দিন বিলেতে ছিলেন। দেশে ফিরে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সমাজের মক্ষীরানি হয়ে বসেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে সিগারেট খেতেন, ড্রিংক করতেন। তাঁর অনেক ভক্ত, অনেক অনুরাগী জুটে গিয়েছিল। তারা নিজেদের মধ্যে তার ব্যাপার নিয়ে এত ঝগড়া-বিবাদ, এত হানাহানি করেছে যে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর পরিচিতি দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় চিত্রাভিনেত্রীর কাছাকাছি পৌঁছেছিল। তা ছাড়া মহিলার মাথায় ছিট ছিল। আজকে যার সঙ্গে হেসে কথা বলতেন, কাল তার গালে চড় বসিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা অনুভব করতেন না।

হুশিয়ার মানুষেরা মহিলাকে প্লেগের মতো ভয় করতে লাগলেন। প্রেমের জাগ্রত দেবী মনে করে একদল পেছনে ছুটতে থাকল। মহিলারা গার্হস্থ্য শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তার মুখের ওপর বাড়ির দরোজা বন্ধ করে দিতে আরম্ভ করলেন। আত্মীয়স্বজনেরা এতদূর বিগড়ে গিয়েছিল যে পারলে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে তাকে খুন করত। ঢাকা শহর বড় শহর নয়। এখানে সকলে সকলের হাঁড়ির খবর খুব সহজে জেনে যায়। মোটমাট পরিস্থিতিটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে এই সম্প্রসারণশীল শহরটি তার ওজন বইতে পারছিল না। এইরকমের একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে মহিলা আলি কেনানের কাছে আসতে শুরু করেন।

এখনো মহিলা আলি কেনানের কাছে আসেন। পা ছুঁয়ে সালাম করেন। তার খাস দিলের দোয়া প্রার্থনা করেন। মহিলা যেদিন আসেন আলি কেনানের অস্থিরতা ভয়ংকর বেড়ে যায়। তাকে সামলাতে শিষ্যদের হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। মেয়ে-সেবিকাদের পদাঘাত সহ্য করতে হয়। একনাগাড়ে এই অবস্থা পাঁচ দিন ধরে চলতে থাকে। সেজন্য মহিলা এলেই তার শিষ্যকুল সচকিত হয়ে ওঠে। যদি ক্ষমতা থাকত, আলি কেনানের সঙ্গে তাকে দেখা করতে দিত না। বিলেতফেরত অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা যাকে দেখলে পুরুষ ঘোড়া পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তাকে ঠেকানোর ক্ষমতা আলি কেনানের শিষ্যদের কী করে হবে?

এই সময়ে মহিলার সঙ্গে এক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। এই ভদ্রলোকেরও দিনকাল তখন ভালো যাচ্ছিল না। তাঁকে ছেড়ে তাঁর স্ত্রী আর একজনের সঙ্গে আমেরিকা পালিয়েছে। তারা একজন অন্যজনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কিঞ্চিৎ মানসিক সান্ত্বনা লাভ করে। যথাসম্ভব গোটা শহরের সহানুভূতিহীন দৃষ্টি এড়িয়ে একে অন্যের সঙ্গে দেখা করত, সিনেমায় যেত। কিংবা ছুটির দিনে দূরে কোথাও চলে যেত। এভাবে তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

একদিন মহিলা ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আলি কেনানের কাছে আসেন। আলি কেনানের পা ছুঁয়ে সালাম করে ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন,

বাবা ইনি আমার বন্ধু। আপনি আমাদের খাস দিলে দোয়া করবেন। আলি কেনানের ভদ্রলোককে খুন করার ইচ্ছে জেগেছিল। কিন্তু উপস্থিত লোকজনের সামনে তাকে বলতে হল,

বেটি তোগো উপরে বাবা বু আলি কলন্দরের দোয়া আছে। কুনু চিন্তা নাই। সব ঠিক অইয়া যাইব। সেদিন ঘরে ফিরে আলি কেনান চিৎকার করে বলতে লাগল, শালা খানকির বাচ্চা, খেয়াল রাখিস তুই কার জিনিসের উপর নজর দিছস। খুন কইরা ফেলামু। কইলজা টাইন্যা ছিড়া ফেলামু। শরীলের লউ খাইয়া ফেলামু। আজরাইলের নাহান কবজ কইর‍্যা ফেলামু। অক্ষম আক্রোশে সে রাতভর হাত-পা ছোড়ে। খাটের উপর পদাঘাত করে যায় ক্রমাগত।

মহিলা তার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুটি নিয়ে ক্রমাগত আসে। আলি কেনানকে সালাম করে। ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। কানে কানে নিজেরা আলাপ করে। আলি কেনানকে এ দৃশ্য দেখতে হয়। দেখে নীরবে হজম করতে হয়। সন্ধের পর ডেরায় যখন ফেরে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো অন্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে থাকে। যেত রাত অধিক হয়, রাগের মাত্রাও বাড়তে থাকে। তার উন্মত্ত প্রলাপে শিষ্যদের কারো ঘুমোবার উপায় থাকে না। সে বলতে থাকে:

শালা পাটকাঠির মতন তর শরীল। তুই হেরে সামলাইতে পারবি না। তর চোখ দুইড্যা ট্যারা। কয় পয়সা তর আছে? তুই হেরে ছাইড়া দে। হে আমার। হেরে আমি রানি বানামু। হের লগে আমি দ্যাশ ছাইড়া চইল্যা যামু। আর যদি তর লগে দেখি লাশ পইরা থাকপো—কইয়া রাখলাম।

ধীরে ধীরে আলি কেনানের সবকিছুর প্রতি আগ্রহ কমে আসতে শুরু করে। রাতের নিভৃত প্রলাপগুলো দিনের বেলাও বলা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। মানুষজনের প্রতি আর কোনো আকর্ষণ বোধ করে না। একেকটা দিন চলে যায়, সে নিজেকে ফাঁদে পড়া পশুর মতো মনে করতে থাকে। যদি পারত ধারালো ছুরি দিয়ে সব বন্ধন ছিন্ন করে ঐ মহিলার পেছন পেছন ছুটে যেত। তাকে আলিঙ্গন করে বলত,

তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না, তুমি আমাকে নাও, আমাকে গ্রহণ করো। গ্রহণ করো এই উন্মত্ততা, এই বেদনা, এই দুঃখ, এই অস্থিরতা। মহিলা রাজি না হলে বুকে ছুরি বসিয়ে খুন করত, তারপর নিজে আত্মহত্যা করত।

মাসখানেক সময়ের মধ্যে সেই মহিলা ও ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের সম্পর্ক অনেক নিবিড় হয়ে এসেছে। তারা স্থির করল বিয়ে করবে। মহিলা বিলেতফেরত হলে কী হবে মনে কুসংস্কারের অন্ত নেই। তিনি মনে করলেন বাবার দোয়াতেই তিনি এত তাড়াতাড়ি একটা স্বামী জুটিয়ে নিতে পারলেন। বাবার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা অনেক গুণে বেড়ে গেল।

তাঁর হবু স্বামীকে সঙ্গে করে এক সন্ধ্যাবেলা আলি কেনানের আস্তানায় এসে পদধূলি নিলেন এবং হবু স্বামীটিকেও পদধূলি নিতে বাধ্য করলেন। যা আলি কেনানের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, সেই প্রাণগলানো কণ্ঠস্বরে আলি কেনানকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন:

বাবা একটু খাস দিলে দোয়া করবেন। আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি। হাতে বিশেষ সময় নেই। তবু আপনার অনুমতি এবং দোয়া চাইতে এসেছি।

আলি কেনানের মনে হয়েছিল, দুনিয়া দুটুকরো হয়ে গেছে, সূর্য নিভে গেছে। কে যেন তার বুকে তীক্ষ্ণধার ছুরি আমূল বিধিয়ে দিয়েছে। তবু তাকে বলতে হল,

বেটি তর উপর বু আলি কলন্দর বাবার দোয়া আছে। সব ঠিক অইয়া যাইব।

সেদিন সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে আলি কেনান কোত্থেকে একটা রামদা খুঁজে বের করে একটি পাথরের ওপর অনেকক্ষণ ধরে শান দিতে লাগল। শিষ্যদের কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস করল না, যদি একটা কোপ দিয়ে বসে। তারপর রামদাটি দুহাতে ঊর্ধ্বে তুলে চিৎকার করতে থাকল:

শালা, অহনও সময় আছে, তুই হেরে ছাইরা দে। হে আমার জিনিস। তুই অরে ছুঁইলে এই রামদা দিয়া তরে কুচিকুচি কইরা কাইট্যা গাঙে ভাসাইয়া দিমু। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ডানে-বামে রামদাটি ঘোরাতে থাকে। তারপর একসময় ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢোকে।

ঘরে ঢুকে সে তোশকটা উলটায়। তোশকের নিচে ভাঁজে ভাঁজে রাখা টাকার তোড়া। অনেক টাকা, অনেকগুলো বান্ডিল। সব একসঙ্গে জড়ো করে আবার চিৎকার আরম্ভ করে, আমার ভেস্তের হুর, আমার আসমানের চান, আমার হইলদ্যা পাখি। তুই আমার কাছে আয়। এই ট্যাহা বেবাক তর। অনেক ট্যাহা। শেখ মুজিবের ব্যাংকেও অত ট্যাহা নাই । সব তর লাইগ্যা। সব তর লাইগ্যা। তুই আয়, গতরের চামড়া দিয়া তর জুতা বানাইয়া দিমু। শরীরের লউ দিয়া তর পায়ে আলতা কইরা দিমু। তুই আয়, তুই আয়। তরে ছাড়া আমার চলত না। বেবাক দুনিয়া লইয়া আমি কী করুম? তুই আয় তুই আয়। একসময় ক্ষিপ্তের মতো টাকার বান্ডিলগুলো একের পর এক বাইরে ছুড়ে মারতে থাকে।

আমার আসমানের চান নাই, আমার দিনের সুরুজ ডুইব্যা গেছে। হইলদ্যা পাখি উইড়া গেছে। আমি কাগজের ট্যাহা লইয়া কী করুম? সে হাউমাউ করে উচ্চ শব্দে কাঁদতে থাকে। অনেকক্ষণ প্রাণফাটা চিৎকার করার পর একসময়ে বিছানায় ঢলে পড়ল।

তাকে বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখে শিষ্যসাগরেদরা টাকার বান্ডিলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে যে যার মতো রাতের অন্ধকারে কেটে পড়ল। আলি কেনানের সেবা করে কাউকে নিরাশ হতে হয়নি।

তার পরদিন ভোরবেলা পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে তার ঘুম ভাঙে। আলি কেনানের মনে পড়ল আগের রাতে সে কিছু খায়নি। মাথাটা ব্যাথায় টনটন করছিল। দুহাতে টিপে ধরে উঠে দাঁড়াল। তখনই তার আনুপূর্বিক সমস্ত কথা মনে পড়ে গেল। সে দাঁত তোলার মতো ব্যথা অনুভব করতে লাগল। জীবনের সমস্ত সাধ, সমস্ত স্বপ্ন মিটে গেছে। তবু জীবন—এ পোড়া জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। হায়রে জীবনের বিড়ম্বনা, হায়রে জীবনের মায়া! সে কিছু খেতে চাইল। আজ কেউ আসেনি। কী ব্যাপার। সবাই গেল কই? উঠে সবগুলো ঘর তন্নতন্ন করে দেখল সব খাঁখাঁ করছে। একটিও জনমানব নেই। কাউকে না পেয়ে রাস্তার কাছে চলে এল। মোড়ের দোকানে রেডিয়োতে শুনতে পেল শেখ মুজিবের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। আলি কেনানের চোখের সামনে গোটা জগৎটাই দুলে উঠল। সে বিড়বিড় করে বলতে থাকল,

শেখ মুজিবর বাইচ্যা নাই, আমি ঢাকায় থাকুম কেরে? হের সমাজতন্ত্র অইল না, আমি হইলদ্যা পাখিরে হারাইলাম। ভোলায় চইল্যা যামু। অই তরা আমারে একটা লঞ্চের টিকেট কাইট্যা দে।

কিন্তু তার চিৎকার হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকল। সময় নষ্ট না করে শোবার ঘরে ঢুকে তোশকটা উলটে পালটে দেখল। অবাক কাণ্ড! একটা আধুলিও পড়ে নেই। কাল এই তোশকের তলায় থরে থরে সাজানো ছিল টাকার বান্ডিল। আজ কিচ্ছু নেই। সব হাওয়া। মাজারে ঢুকে গলা চড়িয়ে বলতে থাকল, হাতে একটা পয়সাও নাই। আমি ভোলায় মা-বাপর কাছে ফেরত যামু কেমনে? কেমনে যামু?

মাজারের ভেতরে তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে থাকল – কেমনে যামু? কেমনে যামু?...